BDeBooks.com

E-BOOK

www.BDeBooks.com
FB.com/BDeBooksCom
BDeBooks.Com@gmail.com

www.BDeBooks.Com

হুমায়ূন আহমেদ-এর আত্মজীবনী

ফাউনটেনপেন

www.BDeBooks.Com

হুমায়ূন আহমেদ এর আত্মজীবনীমুলক উপন্যাস ফাউনটেনপেন ধারাবাহিক ভাবে কালের কন্ঠ পত্রিকার সাপ্তাহিক সাহিত্য ম্যাগাজিন শিলালিপি তে প্রকাশিত হয়েছিল। পাঠকদের সুবিধার্থে সবগুলো খন্ড একত্র করে বই আকারে প্রকাশ করা হল।

ধন্যবাদ

www.BDeBooks.Com

ফাউনটেনপেন

কেটেছে একেলা
বিরহের বেলা

এক মাস ধরে বইমেলা চলছে। আমি ঘরে বসে বিরহের বেলা কাটাচ্ছি। মেলায় যেতে না পারার বিরহ। সম্প্রতি ঘরে সিগারেট খাওয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করায় আমাকে কিছুটা সময় বারান্দায় বসে থাকতে হয়। বারান্দাটা এমন যে এখান থেকে দালানকোঠা ছাড়া কিছু দেখা যায় না। তবে একটা আমগাছ চোখে পড়ে। আমগাছে মুকুল এসেছে। বসন্তের নমুনা বলতে এটুকুই।
আমাকে বারান্দায় বসে থাকতে দেখলেই পুত্র নিষাদ পাশে এসে বসে। সে এখন ' কেন?' _স্টেজে আছে। এই স্টেজের বাচ্চারা ' কেন?' ' কেন?' করতেই থাকে।
বাবা, বারান্দায় বসে আছ কেন?
আমগাছ দেখছি।
আমগাছ দেখছ কেন?
দেখতে ভালো লাগছে, তাই দেখছি।
ভালো লাগছে কেন?
জানি না।
জানো না কেন?
বাবা! যথেষ্ট বিরক্ত করেছ। এখন তোমাকে ধরে আমি একটা আছাড় দিব।
আছাড় দিবে কেন?
পুত্র কেন কেন করতে থাকুক, আমি মূল রচনায় ফিরে যাই। বইমেলা বিষয়ক রচনা। মেলায় নিজে যেতে না পারলেও টিভি চ্যানেল এবং পত্রিকার কলামে মেলা দেখা হচ্ছে। ভালোমতোই হচ্ছে। মাঠে না গিয়ে ঘরে বসে টেলিভিশনে ক্রিকেট খেলা দেখার মতো। অনেক খুঁটিনাটি চোখে পড়ছে। মেলায় উপস্থিত থাকলে চোখে পড়ত না।
কিছু লেখক এবং প্রকাশককে দেখলাম ঐতিহ্য নিয়ে চিন্তায় অস্থির। ঐতিহ্য বজায় রাখতেই হবে। মেলা বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণেই হতে হবে। অন্য কোথাও হওয়া যাবে না।
গায়ে গা লাগিয়ে মানুষ হাঁটছে। বই হাতে নিয়ে দেখার সুযোগ নেই। বাচ্চারা ভিড়ে অস্থির হয়ে কাঁদছে। কেউ কেউ হারিয়ে যাচ্ছে। বখাটে ছেলেরা থাকছে যদি সুযোগ বুঝে কোনো তরুণীর গায়ে হাত রাখা যায়। তসলিমা নাসরিন দেশে নেই। তরুণী লাঞ্ছিত হলেও লেখার কেউ নেই। লাঞ্ছিত হলেও ঐতিহ্য তো বজায় থাকবে।
টিভিতে বইমেলা দেখে আমি মাঝে মাঝেই আতঙ্কে অস্থির হয়েছি। যদি আগুন লাগে, যেখানে আগুন লেগেছে সেখানে কি দমকলের গাড়ি পেঁৗছতে পারবে? ছোটাছুটি শুরু হলে বাচ্চারা কোথায় যাবে? কলকাতার অতি প্রশস্ত বইমেলাও একবার আগুনে পুড়ে ছাই হয়েছিল। সে সময় আমি কলকাতার বইমেলায়। কী ভয়ঙ্কর অবস্থা হয়েছিল আমার জানা আছে।
ঐতিহ্য- প্রেমিকদের বলছি, ঐতিহ্যও বদলায়। একসময় আমাদের পূর্বপুরুষরা ধুতি পরতেন। ধুতি পরার ঐতিহ্য থেকে আমরা সরে এসেছি। আগের লেখকরা ঝর্না কলমে লিখতেন। এখন অনেকেই কম্পিউটারে লেখেন। ঝর্না কলম নামক ঐতিহ্যের মৃত্যু।

www.BDeBooks.Com

বাংলা একাডেমীর পাশেই বিশাল মাঠ পড়ে আছে। সেই মাঠ কারো চোখে পড়ছে না। আমরা আটকে আছি খুপরিতে। বাংলা একাডেমীর কর্তারা কেন মেলা পরিচালনা করছেন তাও বুঝতে পারছি না। মেলা পরিচালনা করবেন প্রকাশকরা। নীতি তাঁরা নির্ধারণ করবেন।

বইমেলায় হেঁটে বেড়ানো, নতুন প্রকাশিত বই হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখার আনন্দ থেকে বাংলা একাডেমী পাঠককে বঞ্চিত করছে। মেলা তাঁদের হাতের মুঠোয় রেখে দিয়েই কাজটা করছে। প্রসঙ্গক্রমে অতীতের এক বইমেলার ঘটনা বলি, আমি একটা স্টলে বসেছি। কিছুক্ষণের মধ্যেই বাংলা একাডেমীর ডিজি আমার কাছে চলে এলেন। তাঁর নাম, আচ্ছা থাক, নাম বললাম না। ডিজির চোখ- মুখ শক্ত। তিনি বললেন, আপনি মেলায় থাকতে পারবেন না।

আমি অবাক হয়ে বললাম, কেন পারব না?

তিনি বললেন, আপনার কারণে মেলায় বিশৃঙ্খলা হচ্ছে। দুর্ঘটনা ঘটবে। আপনাকে এক্ষুনি উঠে যেতে হবে।

আমি বললাম, ব্যবস্থা করে দিন যাতে বিশৃঙ্খলা না হয়। লেখক হিসেবে আমার অধিকার আছে মেলায় আসার। বইমেলা শুধু পাঠক- প্রকাশকের মেলা নয়। লেখকদেরও মেলা।

আপনার সঙ্গে তর্কে যাব না। আপনাকে মেলা ছেড়ে চলে যেতে হবে।

আমি বেশ মন খারাপ করে বাসায় চলে এলাম। তারপর অবশ্য ঘটনা অনেকদূর গেল। অনেক প্রকাশক ঘোষণা করলেন তাঁরা মেলা করবেন না। সংসদে পর্যন্ত বিষয়টি উঠল। বাংলা একাডেমীর ডিজি আমার ধানমণ্ডির বাসায় উপস্থিত হয়ে বলতে শুরু করলেন, আমার লেখা তাঁর কত পছন্দ ইত্যাদি।

আমি মেলায় যাওয়া এরপর থেকে বন্ধই করে দিলাম। এক দিন কিংবা দুদিন শুধু যাই। আমার অবস্থা চিলের মতো। চিল আকাশে ওড়ে, তার মন পড়ে থাকে মাটিতে। আমি আমার ঘরের বারান্দায় বসে থাকি, আমার মন পড়ে থাকে বইমেলায়।

আমি যে ফ্ল্যাটে থাকি, তার পাশের ফ্ল্যাটে থাকেন মাজহারুল ইসলাম, অন্যপ্রকাশের মালিক। তিনি হুমায়ূন আহমেদ টাইপ বাজারি লেখকদের বই ছেপে কুখ্যাতি অর্জন করেছেন। তার স্টলের সামনে নাকি ভিড় লেগে থাকে। অপরিপক্ক তরুণ- তরুণীরা মাছির মতো ভিড় করে বাজারি লেখকদের বই কিনতে চায়।

ভালো কথা, বাজারি লেখক বিষয়টি আরো পরিষ্কার করা দরকার। বাজারি লেখক মানে তুচ্ছ লেখক। তেল- সাবান- পেঁয়াজ- কাঁচামরিচ বিক্রেতা টাইপ লেখক। এদের বই বাজারে পাওয়া যায় বলেও বাজারি। যাঁদের বই বাজারে পাওয়া যায় না, তাঁদের বাড়িতে কার্টুন ভর্তি থাকে, তাঁরা মহান লেখক, মুক্তবুদ্ধি লেখক, কমিটেড লেখক, সত্যসন্ধানী লেখক। তাঁদের বেশির ভাগের ধারণা, তাঁরা কালজয় করে ফেলেছেন। এঁরা বাজারি লেখকদের কঠিন আক্রমণ করতে ভালোবাসেন। তাঁদের আক্রমণে শালীনতা থাকে। তাঁরা সরাসরি কখনো আমার নাম নেন না। তবে বুদ্ধিমান পাঠকরা বুঝে ফেলেন কাকে ধরা হচ্ছে। তাঁদের আক্রমণের নমুনা, ' অন্যপ্রকাশের সামনে জনৈক বাজারি লেখকের বইয়ের জন্য তরুণ- তরুণীর সমাবেশ দেখে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতে হয়। এরা সৎসাহিত্য থেকে বঞ্চিত। কষ্টকল্পিত উদ্ভট চরিত্রের গালগল্পে বিভ্রান্ত। বাজারি লেখক এবং তার প্রকাশকের অর্থ জোগান দেওয়া ছাড়া এই তরুণ- তরুণীরা আর কিছুই করছে না।...'

কালজয়ী এসব মহান লেখকের সঙ্গে মাঝে মাঝে আমার দেখা হয়ে যায়। বেশির ভাগ দেখা হয় দেশের বাইরের বইমেলায়। আমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে তাঁরা কিছুটা বিচলিত বোধ করেন। কেন করেন তা আমার কাছে স্পষ্ট নয়। এমন একজনের সঙ্গে কথোপকথনের নমুনা_

কালজয়ী : কেমন আছেন?

আমি : জি ভালো।

কালজয়ী : ইদানীং কিছু কি লিখছেন?

আমি : একটা সস্তা প্রেমের উপন্যাস লেখার চেষ্টা করছি। যতটা সস্তা হওয়া দরকার ততটা সস্তা হচ্ছে না বলে অস্বস্তিতে আছি। আপনার দোয়া চাই যেন আরেকটা সস্তা লেখা লিখতে পারি।

www.BDeBooks.Com

কালজয়ী : (গম্ভীর)
আমি : আপনি কি মহান কোন লেখায় হাত দিয়েছেন?
কালজয়ী : আপনার রসবোধ ভালো। আচ্ছা পরে কথা হবে।

কালজয়ীরা আবার স্তুতি পছন্দ করেন। তাঁরা নিজেদের গ্রহ মনে করেন বলেই উপগ্রহ নিয়ে ঘোরাফেরা করতে পছন্দ করেন। গ্রহদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ কখনোই থাকে না কিন্তু উপগ্রহের সঙ্গে থাকে। উপগ্রহরা উপযাজক হয়েই টেলিফোন করেন। তাঁদের টেলিফোন পেলে আতঙ্কিত বোধ করি। কেন আতঙ্কিত বোধ করি তা ব্যাখ্যা করছি_ উপগ্রহের টেলিফোন এসেছে, কণ্ঠ উত্তেজিত। উত্তেজনার ভেতর চাপা আনন্দ।
হুমায়ূন ভাই! আপনাকে তো শুইয়ে ফেলেছে।
কে শুইয়েছেন?
বদরুদ্দীন উমর।
কোথায় শোয়ালেন?
সমকাল পত্রিকার সেকেন্ড এডিটরিয়েলে। উনি বলেছেন, আপনার লেখায় শিক্ষামূলক কিছু নাই।
এটা তো উনি ঠিকই বলেছেন। আমি তো পাঠ্যবই লিখি না। আমার বই শিক্ষামূলক বই হবে কেন? জীবনে একটাই পাঠ্যবই লিখেছিলাম_ কোয়ান্টাম রসায়ন । সম্ভবত ওনার চোখ এড়িয়ে গেছে।
না হুমায়ূন ভাই, আপনি জিনিসটা হালকা দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। একটা বাদানুবাদ হওয়া উচিত। আপনি একটা কাউন্টার লেখা দিন। এটা আমার রিকোয়েস্ট।
আমি টেলিফোনের লাইন কেটে দিলাম। রাতের আড্ডায় [illegible] ঋড়ড়ষং' ঈষঁন) আমার সমকাল- এর পাতায় শুয়ে পড়ার ঘটনা বললাম। বন্ধুরা আনন্দ পেল। আমার যেকোনো পতন আমার বন্ধুদের কাছে আনন্দময়।
এখন শিক্ষা বিষয়ে বলি। অতি বিচিত্র কারণে বাংলাদেশের মানুষ সব কিছুতেই শিক্ষা খোঁজে। গল্প- উপন্যাসে শিক্ষা, নাটক- সিনেমায় শিক্ষা। একসময় ঈদে প্রচারিত হাসির নাটকের শুরুতেই আমি লিখে দিতাম_ ' এই নাটকে শিক্ষামূলক কিছু নেই।'
সাধারণ মানুষ এবং অসাধারণ সমালোচকরাই শুধু যে শিক্ষা খোঁজেন তা নয়, দেশের প্রধানরাও শিক্ষা নিয়ে আগ্রহী। তাঁরাও একে অন্যকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য নানান ব্যতিক্রমী কর্মকাণ্ড হাতে নেন।
শিক্ষা নিয়ে এত উদ্বেগের পরও জাতি হিসেবে আমরা ক্রমেই মূর্খ হচ্ছি কেন কে বলবে?
আচ্ছা শিক্ষা আপাতত থাকুক। মহান কালজয়ীরা বর্তমানের কুসাহিত্য নিয়ে চিন্তায় অস্থির হতে থাকুন, আমি ফিরে যাই বইমেলায়। আপনারা কি জানেন, মেলায় প্রকাশিত চমৎকার সব প্রচ্ছদের বইগুলোর বেশির ভাগ লেখক প্রবাসী! তাঁরা বছরে একবার ডলার- পাউন্ড পকেটে নিয়ে দেশে আসেন। প্রকাশকদের সঙ্গে চুক্তি হয়। খরচ তাঁদের। প্রকাশকরা শুধু বই ছেপে দেবেন। প্রবাসী লেখকদের বইয়ের মোড়ক উন্মোচন খুব ঘটা করে হয়। আমাদের দেশের মন্ত্রীদের হাতে কাজকর্ম নেই বলেই হয়তো মোড়ক উন্মোচন নামক অনুষ্ঠানে তাঁদের ডাক পেই পাওয়া যায়।
দুই বছর আগের কথা। এক প্রবাসী কবির বই বের হয়েছে, তিনি চাচ্ছেন আমি বইটির মোড়ক উন্মোচন করি। আমি বললাম, না। আমি একদিনের জন্য মেলায় যাই। সেদিনটা মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে নষ্ট করব না।
ভদ্রলোক এবং তাঁর স্ত্রী অত্যন্ত মন খারাপ করলেন। তাঁদের মন খারাপ দেখে আমার নিজের মন খারাপ হয়ে গেল। আমি তখন বিকল্প প্রস্তাব দিলাম। আমি বললাম, আপনারা নুহাশ পল্লীতে চলে আসুন। নুহাশ পল্লীর দিঘিতে আমার একটা নৌকা আছে। আপনি নৌকায় বসে নিজের কবিতা আবৃত্তি করবেন। আমরা দিঘির ঘাটে বসে থাকব। পুরো অনুষ্ঠান ভিডিও করে আপনাকে একটা কপি দেব। সেই ভিডিও আপনি বন্ধু বান্ধবদের দেখাবেন। এর জন্য আপনাকে একটি পয়সাও খরচ করতে হবে না। নুহাশ চলচ্চিত্র ভিডিও করে দেবে।
ভদ্রলোক আনন্দে অভিভূত হলেন।

www.BDeBooks.Com

যথাসময়ে অনুষ্ঠান হলো। তিনি নৌকায় দাঁড়িয়ে কবিতা আবৃত্তি করছেন। আমাদের ব্যবস্থা দেখে তাঁর চোখে একটু পর পর পানি আসছে। তিনি চোখ মুছছেন। তাঁর স্ত্রীও আমার পাশে বসেই কবিতা শুনছিলেন। তিনি একপর্যায়ে জলভরা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে ইংরেজিতে যা বললেন তার সরল বাংলা হলো, তাঁদের দুজনের জীবনে অন্যতম সেরা অভিজ্ঞতা আজকের অভিজ্ঞতা। তাঁরা সারা জীবন এই সুখস্মৃতি অন্তরে লালন করবেন। তাঁর স্বামীর একটা কবিতার বইও যদি কেউ না কেনে, তাতেও কিছুই আর যায় আসে না।

এই প্রবাসী কবির কথা থাকুক, অন্য আরেকজনের গল্প করি। তিনি কানাডাপ্রবাসী কবি। তাঁর নাম ইকবাল হাসান। প্রতিবছরই বইমেলায় তাঁর কবিতার বই প্রকাশিত হয়। এই কবি আমাকে একবার ভালো বিপদে ফেলেছিলেন। বিপদের গল্পটি বলা যেতে পারে।

আমি গিয়েছি নিউইয়র্কে। বিশ্বজিৎ সাহা বইমেলার আয়োজন করেছেন। আমি বইমেলার অতিথি। মেলা উপলক্ষে কানাডা থেকে কবি ইকবাল হাসান এসেছেন। তিনি আমাকে ধরে বসলেন, একটা ইন্টারভিউ তাঁকে দিতেই হবে। আমার নিশ্চয়ই তখন শনির দশা চলছিল, কাজেই রাজি হয়ে গেলাম। ইন্টারভিউ পর্ব শুরু হওয়া মাত্র বুঝলাম_ঘটনা অন্য। ইকবাল হাসানের প্রশ্নের নমুনা শুনলে পাঠকও বলবেন, ঘটনা অন্য। প্রশ্নের নমুনা_

' অনেকেই এখন বলছেন আপনি উপন্যাস হিসেবে যা লেখেন তা আসলে অপন্যাস। আপনি কী বলেন?'

' আপনার হালকা লেখাগুলি কি বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে লেখা হয়?'

' জীবনের গভীর বোধ আপনার লেখায় অনুপস্থিত কেন?'

' একই গল্প আপনি একটু এদিক ওদিক করে লেখেন। আপনার এই সীমাবদ্ধতার কারণ কী?

' আপনার বানানো নাটক- সিনেমা আপনার বইগুলির মতোই হালকা এবং অগভীর। এর কারণ কী?'

আমি হাসিমুখে সব প্রশ্নের উত্তর দিলাম। তিনি যে উত্তর শুনতে চাইছেন তা- ই বললাম। বললাম, আমার লেখা সস্তা। টাকার জন্য লেখি_এইসব।

এবারের বইমেলায় (২০১০) ইকবাল হাসান এসেছেন। সমকাল পত্রিকায় কলাম লিখছেন। হঠাৎ সেখানে আমাকে নিয়ে এক লেখা। কি লেখা থাকবে জানি। ভদ্রভাবে গালাগালি। কবিরা সুন্দর কাব্যময় গদ্যে গালাগালি করতে পারেন। ইকবাল হাসানের লেখা পড়ে চমকালাম। ইকবাল হাসান উল্টাগীত ধরেছেন। রচনা পাঠ করে মনে হলো_হুমায়ূন আহমেদ একজন মহান লেখক। যাঁরা তার নিন্দামন্দ করেন, তাঁরাও সুযোগ পেলেই গোপনে তার বই পড়েন ইত্যাদি।

আমার খুশি হওয়া উচিত, কিন্তু খুশি হওয়া গেল না। মনে হলো কবি নিশ্চয়ই অসুস্থ। সুস্থ ইকবাল হাসান এ ধরনের লেখা অবশ্যই লিখবেন না।

তিনি দুপুরে টেলিফোন করে জানতে চাইলেন, আমি তাঁর লেখা পড়েছি কি না।

আমি বললাম, পড়েছি। উল্টাগীত গাইছেন কেন?

কবি বললেন, আগে যখন আপনার ইন্টারভিউ নিয়েছি, তখন আমি অপরিপক্ব ছিলাম।

আমি বললাম, এখন কি পেকেছেন?

কবি হতাশাগ্রস্ত গলায় বললেন, হুমায়ূন ভাই, আমি এ দেশের একমাত্র কবি যে আপনার নুহাশ পল্লী নিয়ে কবিতা লিখেছে। আর কেউ কিন্তু লিখেনি। আপনি কেন এরকম করে আমার সঙ্গে কথা বলছেন!

আমি তাঁকে ধন্যবাদ দিলাম। তাঁর লেখা কবিতাটি পত্রস্থ করা হলো।

<u>নুহাশ পল্লী</u>

নিঃশ্বাস ফেলবে কোথায়? নেবে শ্বাস?
শরীরকে দেবে অক্সিজেন? এখন বাতাসে
শুধু কার্বন ডাই- অক্সাইড_শুষে নেবে তেমন বৃক্ষ কোথায়?

www.BDeBooks.Com

যেদিকে তাকাবে তুমি শুধু দূষিত বাতাস। ' বড় হয়ে
দেখবে, পৃথিবী সুন্দর কতো' _মধ্যবয়সে এসে দেখি,
এসব আশ্বাসবাণী শুধু শূন্যে ঝরে পড়ে। হাওয়া নেই
শহরে ও গ্রামে। সবকিছু গিলে খাচ্ছে বিষাক্ত আকাশ।

যদিও স্বপ্ন দ্যাখায় প্রভাতের রোদ আর রাতের নক্ষত্র
তবু ভাবি : মেঘে মেঘে বেলা তো অনেক হলো, আর কবে
আমাদের গ্রামগুলো নুহাশ পল্লীর মতো স্বয়ম্ভর হবে?
[আকাশপরী, ইকবাল হাসান, পৃষ্ঠা- ১৫, দি রয়েল পাবলিশার্স, ঢাকা]

পাদটীকা

পোকারা আমাদের ওপর রাগ করে কামড়ায় না। তারা বেঁচে থাকতে চায় বলেই কামড়ায়। সমালোচকদের বেলায়ও কথাটা সত্য। তারা আমাদের রক্ত চায়, আমাদের কষ্ট চায় না।
ফ্রেডারিখ নীটেশ

২
ধর্মকর্ম

(বাংলা ভাষার অতি বিচিত্র বিষয় হলো শব্দের দ্বৈততা_গল্পগুজব, ফলমূল, হাসিঠাট্টা, খেলাধুলা। ধর্ম শব্দটি বেশিরভাগ সময়ই কর্মের সঙ্গে উচ্চারিত হয়। সম্ভবত কর্মকে আমরা ধর্মের সমার্থক ভাবি।)
আমি এসেছি অতি কঠিন গোঁড়া মুসলিম পরিবেশ থেকে। আমার দাদা মাওলানা আজিমুদ্দিন আহমেদ ছিলেন মাদ্রাসা শিক্ষক। তাঁর বাবা জাহাঙ্গির মুনশি ছিলেন পীর মানুষ। আমার দাদার বাড়ি ' মৌলবিবাড়ি' নামে এখনো পরিচিত। ছোটবেলায় দেখেছি দাদার বাড়ির মূল অংশে বড় বড় পর্দা ঝুলছে। পর্দার আড়ালে থাকতেন মহিলারা। তাদের কণ্ঠস্বর পুরুষদের শোনা নিষিদ্ধ ছিল বিধায় তারা ফিসফিস করে কথা বলতেন। হাতে চুড়ি পরতেন না। চুড়ির রিনঝিন শব্দও পরপুরুষদের শোনা নিষিদ্ধ। দাদাজান বাড়ির মহিলাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতেন হাততালির মাধ্যমে। এক হাততালির অর্থ- পানি খাবেন। দুই হাততালি- পান তামাক ইত্যাদি।
একবার বড় ঈদ উপলক্ষে দাদার বাড়িতে গিয়েছি। আমার বয়স ছয় কিংবা সাত। দাদাজান ডেকে পাঠালেন। বললেন, কলেমা তৈয়ব পড়।
আমি বললাম, জানি না তো।
দাদাজানের মুখ গম্ভীর হলো। দাদিজান আবার তাৎক্ষণিক শাস্তির পক্ষে। তিনি বললেন, পুলারে শাস্তি দেন। শাস্তি দেন। ধামড়া পুলা, কলেমা জানে না।

www.BDeBooks.Com

দাদাজান বিরক্তমুখে বললেন, সে ছোট মানুষ। শাস্তি তার প্রাপ্য না। শাস্তি তার বাবা- মা' র প্রাপ্য।
বাবা- মা' র শাস্তি হয়েছিল কি না আমি জানি না। দাদা- দাদির কাছ থেকে মুক্তি পাচ্ছি এতেই আমি খুশি। ছুটে বের হতে যাচ্ছি, দাদাজান আটকালেন। কঠিন এক নির্দেশ জারি করলেন। এই নির্দেশে আমি সব জায়গায় যেতে পারব, একটা বিশেষ বাড়িতে যেতে পারব না। এই বিশেষ বাড়িটা দাদার বাড়ি থেকে মাত্র পঞ্চাশ গজের মতো দূরে। গাছপালায় ঢাকা সুন্দর বাড়ি। বাড়ির সামনে টলটলা পানির দিঘি। আমি অবাক হয়ে বললাম, ওই বাড়িতে কেন যাব না?
দাদিজান সঙ্গে সঙ্গে বললেন, পুলা বেশি কথা কয়। এরে শাস্তি দেন। শাস্তি দেন। ধামড়া পুলা, মুখে মুখে কথা।
দাদাজান শাস্তির দিকে গেলেন না। শীতল গলায় বললেন, ওই বাড়িতে ধর্মের নামে বেদাত হয়। ওই বাড়ি মুসলমানদের জন্যে নিষিদ্ধ। দিনের বেলা যাওয়া যাবে। সন্ধ্যার পর না।
আমি ছোটচাচাকে ধরলাম যেন ওই বাড়িতে যেতে পারি। ছোটচাচা বললেন নিয়ে যাবেন। ওই বাড়ির বিষয়ে ছোটচাচার কাছ থেকে যা জানলাম তা হলো_ওই বাড়ি মুসলমান বাড়ি। তবে তারা অন্যরকম মুসলমান। সন্ধ্যার পর পুরুষ মানুষরা নাচে।
ঘটনা কী জানার জন্যে সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নাই। সারাটা দিন ছটফটানির ভেতর দিয়ে গেল। সন্ধ্যা মিলাবার পর ছোটচাচার সঙ্গে ওই বাড়ির বৈঠকখানায় উপস্থিত হলাম। বাড়ির প্রধান শান্ত সৌম্য চেহারার এক বৃদ্ধ আমাকে কোলে নিয়ে আনন্দিত গলায় বললেন, ফয়জুরের ছেলে আসছে। ফয়জুরের বড় পুলা আসছে। এরে কিছু খাইতে দাও।
সন্ধ্যার পর বৈঠকখানায় সত্যি সত্যি পুরুষদের নাচ শুরু হলো। ঘুরে ঘুরে নাচ। নাচের সঙ্গে সবাই মিলে একসঙ্গে বলছে ' আল্লাহু আল্লাহু' । কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের ভেতর মত্ততা দেখা দিল। একজন অচেতন হয়ে মেঝেতে পড়ে গেলেন। কেউ তাকে নিয়ে মাথা ঘামাল না। সবাই তাকে পাশ কাটিয়ে চক্রাকারে ঘুরে নাচতেই থাকল। ছোটচাচা গলা নামিয়ে আমাকে কানে কানে বললেন, একটা মাত্র পড়েছে। আরও পড়ব। ধুপধাপ কইরা পড়ব। দেখ মজা।
ছোটচাচার কথা শেষ হওয়ার আগেই ধুপ করে আরো একজন পড়ে গেল। আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। তখন কিছুই বুঝিনি, এখন মনে হচ্ছে_এরা কি কোনোভাবে সুফিবাদের সঙ্গে যুক্ত? ড্যান্সিং দরবেশ? এদের পোশাক সে রকম না, লুঙ্গি- গামছা পরা মানুষ। কিন্তু নৃত্যের ভঙ্গি এবং জিগির তো একই রকম। ড্যান্সিং দরবেশদের মধ্যে একসময় আবেশ তৈরি হয়। তারাও মূর্ছিত হয়ে পড়ে যান। এখানেও তো তাই হচ্ছে।
সমস্যা হলো বাংলাদেশের অতি প্রত্যন্ত অঞ্চলে সুফিবাদ আসবেইবা কীভাবে? কে এনেছে? কেন এনেছে? যখন কলেজে পড়ি (১৯৬৬) তখন কিছু খোঁজখবর বের করার চেষ্টা করেছি। এই বিশেষ ধরনের আরাধনা কে প্রথম শুরু করেন? এইসব। উত্তর পাইনি। তাদের একজনের সঙ্গে কথাবার্তার নমুনা দিচ্ছি।
প্রশ্ন: নাচতে নাচতে আপনি দেখলাম অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। তখন কী হয়?
উত্তর: ভাবে চইলা যাই।
প্রশ্ন: কী রকম ভাব?
উত্তর: অন্য দুনিয়ার ভাব।
প্রশ্ন: পরিষ্কার করে বলুন।
উত্তর: বলতে পারব না। ভাবের বিষয়।
প্রশ্ন: চোখের সামনে কিছু দেখেন?
উত্তর: ভাব দেখি। উনারে দেখি।
প্রশ্ন: উনারে দেখেন মানে কী? উনি কে?
উত্তর: উনি ভাব।
সুফিবাদের উৎস হিসেবে ধরা হয় নবীজি (দ.)- এর সঙ্গে জিব্রাইল আলায়েস সালামের সরাসরি সাক্ষাতের হাদিস থেকে। একদিন নবীজি (দ.) বসে ছিলেন। মানুষের রূপ ধরে জিব্রাইল আলায়েস সালাম তাঁর সামনে উপস্থিত হলেন। তিনটি বিষয় নিয়ে কথা বললেন। একটি হলো- নিবেদন (Submission, ইসলাম), আরেকটি হলো বিশ্বাস (Fai t h, ঈমান),

www.BDeBooks.Com

আর তৃতীয়টি হলো সুন্দর কর্মসাধন (Doing the beautiful)।
প্রথম দুটি ইসলাম এবং ঈমান, ধর্মের পাঁচস্তম্ভের মধ্যে আছে। তৃতীয়টি নেই। এই তৃতীয়টি থেকেই সুফিবাদের শুরু। সুফিবাদ বিষয়ে আমার জ্ঞান শুধু যে ভাসাভাসা তা নয়, ভাসাভাসার চেয়েও ভাসাভাসা। দোষ আমার না। দোষ সুফিবাদের দুর্বোধ্যতা এবং জটিলতার। সুফি সাধকদের রচনা পাঠ করেছি। তেমন কিছু বুঝিনি। পশ্চিমাদের লেখা সুফিবাদের বইগুলো জটিলতা বৃদ্ধি করেছে, কমাতে পারেনি।
সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে সুফিবাদ বলছে_'I was a Hidden Treasure, so I loved to be known. Hence I created the creatures that I might be known.' [আমি ছিলাম লুকানো রত্ন। নিজেকে প্রকাশ করার ইচ্ছা হলো। আমি সৃষ্টি করলাম যাতে প্রকাশিত হই।]
সুফিবাদের একটি ধারণা হলো_সৃষ্টিকর্তা মানুষকে করুণা করেন এবং ভালোবাসেন। মানুষ সৃষ্টিকর্তাকে ভালোবাসতে পারবে কিন্তু করুণা করতে পারবে না। ভালোবাসা দু' দিকেই চলাচল করতে সক্ষম, করুণার গতি শুধুই একমুখী। একইভাবে মানুষ পশুপাখিকে ভালোবাসতে পারবে, করুণা করতে পারবে। পশুপাখি মানুষকে ভালোবাসতে পারবে, করুণা করতে পারবে না।
জবধষরঃু বা বাস্তবতা নিয়ে সুফিদের অনেক বিশুদ্ধ চিন্তা আছে। তাদের চিন্তার সঙ্গে আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিন্তার কিছু মিল আছে। সুফিরা বলেন, আমাদের দৃশ্যমান জগৎ অবাস্তব। একমাত্র সৃষ্টিকর্তাই বাস্তব।
সুফিরা বলেন, সৃষ্টিকর্তার মাধ্যমে আমরা দেখি, সৃষ্টিকর্তার মাধ্যমেই আমরা শুনি।
সুফিদের আরাধনার মূল বিষয়টি আমার পছন্দের। তাঁরা প্রার্থনা করেন- 'Show me the things as they are.' [বস্তুগুলো যে- রকম আমাকে সে- রকম দেখাও।] তাঁদের প্রার্থনার ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে, আমরা বস্তুগুলো যে- রকম দেখছি আসলে সে- রকম না। জবধষরঃু- র সমস্যা চলে আসছে।
মূসা (আঃ)- এর সঙ্গে আল্লাহপাকের সাক্ষাতের ঘটনার সুফি ব্যাখ্যা আমার কাছে অদ্ভুত লেগেছে। পাঠকদের সঙ্গে সুফি ব্যাখ্যা ভাগাভাগি করতে চাচ্ছি।
তুর পর্বতের সামনে এই সাক্ষাতের ঘটনা ঘটে। তুর পর্বত কিন্তু বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। অজ্ঞান হয়ে মূসা (আ.) মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। সুফি ব্যাখ্যা হলো, একমাত্র আল্লাহ বাস্তব আর সবই অবাস্তব। কাজেই বাস্তব আল্লাহর উপস্থিতিতে অবাস্তব পাহাড় মিলিয়ে গেল।
আমি কি ধর্মকর্ম বিষয়টা যথেষ্ট জটিল করার চেষ্টা চালাচ্ছি? মনে হয় তাই। সহজিয়া ধারায় চলে আসা যাক। সুফিদের কথা বাদ। নিজের কথা বলি।
ধর্ম নিয়ে আমার আগ্রহ খানিকটা আছে। সিলেট যাব, হজরত শাহজালাল (র.)- এর মাজারে কিছু সময় কাটাব না তা কখনো হবে না। রাজশাহী যাওয়া মানেই নিশিরাতে শাহ মখদুমের মাজার শরীফে উপস্থিত হওয়া। পাঠকদের হজরত শাহ মখদুম সম্পর্কে একটি অন্যরকম তথ্য দিই। তাঁর জীবনী লেখা হয় ফারসি ভাষাতে। মোগল সম্রাট হুমায়ুনের আদেশে এই জীবনী ফারসি থেকে বাংলা তরজমা করা হয়। এই বাংলা তরজমা আদি বাংলা গদ্যের নিদর্শন হিসেবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ছাত্রদের পাঠ্য ছিল। বইটি একসময় বাংলাদেশ বুক কর্পোরেশন প্রকাশ করেছিল। আমার কাছে একটি কপি ছিল। বিটিভির নওয়াজেশ আলী খান পড়তে নিয়ে ফেরত দেননি। বইটির দ্বিতীয় কপি জোগাড় করতে পারিনি। (ফাউনটেনপেন লেখায় যাঁরা আমার সংগ্রহের গুরুত্বপূর্ণ বইগুলো নিয়ে ফেরত দেননি তাদের নাম প্রকাশ করা হবে। কাজেই সাবধান। আমার আরেকটি প্রিয় গ্রন্থ মিসরের গভর্নরকে লেখা হজরত আলীর চিঠি কালের কণ্ঠের সম্পাদক আবেদ খান পাঁচ বছর আগে নিয়েছেন। এখনো ফেরত দেননি।)
পূর্বকথায় ফিরে যাই। আমি যে শুধু ইসলাম ধর্ম প্রচারকদের মাজারে যাই তা কিন্তু না। যে- কোনো ধর্মের তীর্থস্থানগুলোর প্রতি আমার আগ্রহ। এই আগ্রহ নিয়েই পাবনা শহরে অনুকূল ঠাকুরের আশ্রমে একদিন উপস্থিত হলাম। ইনি কথাশিল্পী শীর্ষেন্দুর ঠাকুর। তাঁর প্রতিটি বইতেই থাকবে র:স্থা যা অনুকূল ঠাকুরের সঙ্গে সম্পর্কিত। শীর্ষেন্দুর জবানিতে_একসময় তিনি জীবন সম্পর্কে পুরোপুরি হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। আতদহননের কথা চিন্তা করছিলেন। তখন অনুকূল ঠাকুরের সঙ্গে

www.BDeBooks.Com

তাঁর পরিচয় হলো। অনুকূল ঠাকুর হাত দিয়ে শীর্ষেন্দুকে স্পর্শ করা মাত্র কিছু একটা ঘটে গেল। শীর্ষেন্দু জীবনের প্রতি মমতা ফিরে পেলেন। তাঁর লেখালেখির শুরুও এরপর থেকেই।

অনুকূল ঠাকুরের আশ্রমের সেবায়েতরা আমাকে যথেষ্ট খাতির-যত্ন করলেন। দুপুরে তাদের সঙ্গে খাবার খেলাম। আশ্রমের প্রধান অনুকূল ঠাকুরের বিশাল এক তৈলচিত্রের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে মুগ্ধ গলায় বললেন, ঠাকুরের রহস্যটা একটু দেখুন স্যার। আপনি যেখানেই দাঁড়ান না কেন মনে হবে ঠাকুর আপনার দিকে তাকিয়ে আছেন। উত্তরে দাঁড়ান কিংবা পুবে দাঁড়ান, ঠাকুরের দৃষ্টি আপনার দিকে।

আমি বিনয়ের সঙ্গে বললাম, সরাসরি ক্যামেরা লেন্সের দিকে তাকিয়ে আপনি যদি একটি ছবি তোলেন সেই ছবিতেও একই ব্যাপার হবে। সবকিছুতে মহিমা আরোপ না করাই ভালো। সেবায়েত আমার কথায় মন খারাপ করলেও বিষয়টি স্বীকার করলেন।

অনেক বছর আগে নেপালে হনুমানজির মন্দির দেখতে গিয়েছিলাম। আমাকে ঢুকতে দেওয়া হলো না। হিন্দু ধর্মাবলম্বী ছাড়া সেখানে কেউ যেতে পারবে না। মন্দিরের একজন সেবায়েতের দিকে তাকিয়ে আমার মনে হলো মানুষটা বুদ্ধিমান। আমি তাঁকে কাছে ডেকে বললাম, ভাই, মন্দিরের কাছে কিছু কুকুর দেখতে পাচ্ছি। ওরা মন্দিরের চারপাশে ঘুরতে পারবে, আর আমি মানুষ হয়ে যেতে পারব না। এটা কি ঠিক?

তিনি কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন, আসুন আমার সঙ্গে আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি।

আমি অবশ্যি শেষ পর্যন্ত যাইনি। কেন জানি হঠাৎ করে মন উঠে গেল।

আমাদের অতি পবিত্র স্থান মক্কা শরীফে অমুসলমানদের ঢুকতে দেওয়া হয় না। আমাদের নবীজি (দ.)- এর জীবদ্দশায় অনেক অমুসলমান সেখানে বাস করতেন। কাবার কাছে যেতেন। তাদের ওপর কোনোরকম বিধিনিষেধ ছিল বলে আমি বইপত্রে পড়িনি। ধর্ম আমাদের উদার করবে। অনুদার করবে কেন?

পাদটীকা:

প্রশ্ন: মুসলমান মাত্রই বেতের নামাজের কথা জানেন। তিন রাকাতের নামাজ। বেতের শব্দের অর্থ বেজোড়। এক একটি বেজোড় সংখ্যা। এক রাকাতের নামাজ কি পড়া যায়?

উত্তর: হ্যাঁ যায়।

(আমি মনগড়া কথা বলছি না। জেনেশুনেই বলছি।)

www.BDeBooks.Com

৩

ছাইঞ্চ মিয়া

স্যার, আমার নাম ' ছাইঞ্চ' মিয়া।
কী নাম বলেছ?
ছাইঞ্চ মিয়া।
গ্রামের মানুষদের মধ্যে অদ্ভুত অদ্ভুত নাম রাখার প্রবণতা আছে। তবে সেসব নাম সহজ হয়। উচ্চারণে অসুবিধা হয় না। ' ছাইঞ্চ' যথেষ্ট জটিল। আমি বললাম, এই নামের অর্থ কী?
লেহা- পড়া। এই নামের অর্থ লেহা- পড়া।
আমি বললাম, সায়েন্স থেকে ছাইন্স? বিজ্ঞান?
জায়গামতো ধরছেন স্যার। এইটাও আমার নাম।
ঘটনা যা জানলাম তা হলো ছাইন্স মিয়ার আসল নাম ছাত্তার। সে আট- নয় বছর বয়সে নীলগঞ্জ স্কুলের বিজ্ঞান শিক্ষক আজিজ মাস্টারের বাড়িতে কাজের ছেলে হিসেবে যোগ দেয়। আজিজ মাস্টার ছাত্তারের নানান বিষয়ে আগ্রহ ও কৌতূহল দেখে তাকে আদর করে ডাকতেন সায়েন্স। সেখান থেকে ছাইঞ্চ মিয়া।
এখন তার বয়স পঁয়ত্রিশ। বেঁটেখাটো মানুষ। শক্ত সবল। গাত্রবর্ণ ঘোর কৃষ্ণ। গ্রামের মানুষদের সহজে টাক পড়ে না। এর মাথায় চুলের বংশও নেই। ছাইঞ্চ মিয়া কাজকর্ম কিছু করে না। স্কুলঘরের বারান্দায় ঘুমায়। ছাত্রদের হোস্টেলে রান্নাবান্নার বিনিময়ে খাবার পায়। মাছ মারায় তার বিশেষ পারদর্শিতা আছে। কৈ জাল দিয়ে কৈ মাছ ধরার ব্যাপারে সে একজন বিশেষজ্ঞ। সে নাকি কিছুদিন পরপর মাছ মারার নতুন নতুন কৌশল আবিষ্কার করে।
ছাইঞ্চ মিয়া হাত কচলাতে কচলাতে বলল, আপনার কাছে একটা প্রশ্ন নিয়া আসছি স্যার। অনেকরে জিজ্ঞাস করেছি কেউ বলতে পারে নাই। আজিজ স্যারে বাঁইচা থাকলে উনি পারতেন। উনার মতো জ্ঞানী মানুষ খোদার আলমে নাই বললেই চলে।
আমি বললাম, অনেকেই যখন পারে নাই তখন আমারও না পারার কথা।
প্রশ্নটা কী?
জগতের সব ফল গোল। বেদানা, আপেল, বরই, আঙুর, আম, কাঁঠাল, ডাব, শরিফা। কিন্তু কলা ফলটা লম্বা। এর কারণ কী?
আমি একটু থতমত খেলাম। কী উত্তর দেব বুঝতে পারছি না। ছাইঞ্চ মিয়া বলল, বুঝতাছি আপনে পারতেছেন না। আমি নিজে নিজে একটা উত্তর বাইর করেছি। স্যার বলব?
বলো।
আল্লাপাক গোল পছন্দ করেন এইজন্যে সব ফল গোল। কলা আল্লাপাক পছন্দ করেন না বিধায় কলা লম্বা। কলা খাওয়া এই কারণে ঠিক না। আমি সব ফল খাই, কলা খাই না।
আমি কিছু বললাম না। ছাইঞ্চ মিয়া বলল, যে ফল যত গোল সেটা তত ' উবগার' , আমি হিসাবে এইটা পাই। স্যার ঠিক আছে?
প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে আমি বললাম, তুমি লেখাপড়া কতটুকু জানো?
বাংলা লেখতে- পড়তে পারি। নয় ঘর পর্যন্ত নামতা জানি। আজিজ স্যার শিখায়েছেন। ৯ একে ৯, ৯ দুকুনে ১৮, তিন নং ২৭ ...
ছাইঞ্চ মিয়া নয়ের ঘরের নামতা শেষ করে উঠে দাঁড়াল। মাছ মারতে যাবে। তার কাছে শুনলাম সে কৈ মাছ ধরার একটা পদ্ধতি বের করেছে। এ পদ্ধতিতে শুধু ডিমওয়ালা কৈ মাছ ধরা পড়ে, ডিম ছাড়া কৈ কখনো না।

www.BDeBooks.Com

বিজ্ঞানের শুরুটা কোথায়?

জ্ঞানীরা বলেন, শুরু হলো কৌতূহলে। মানুষ কৌতূহলী হওয়ার কারণেই বিজ্ঞান। গাছের অনুভূতি আছে, কৌতূহল নেই বলেই বিজ্ঞানে গাছের অবদান নেই।

আমি জ্ঞানী না বলেই হয়তো জ্ঞানীদের কথা নিতে পারছি না। আমার মতে, বিজ্ঞানের শুরু খাদ্য অনুসন্ধানে। খাদ্য কোথায় পাওয়া যাবে, কীভাবে পাওয়া যাবে_এই ব্যাকুলতা থেকেই বিজ্ঞান। আর গাছের কৌতূহল নেই তাইবা আমরা ধরে নেব কেন? আমার মনে হয়, গাছ তার নিজের মতো করেই কৌতূহলী। আমরা তার কৌতূহল ধরতে পারছি না। নুহাশ পল্লীতে আমার দিন কাটে গাছপালার সঙ্গে। তাদের জগৎ বোঝার সাধ্যও আমার নেই। সেই চেষ্টাও বড় ধরনের বোকামি ছাড়া কিছু না। তারপরও গাছপালার বনে হাঁটতে হাঁটতে ভাবি_গাছদের কি চিন্তা করার ক্ষমতা আছে? তারা কি ভাবতে পারে? কল্পনা করতে পারে?

বিশাল বৃক্ষকে ' বনসাই' বানানোর প্রবণতা আজকাল দেখতে পাচ্ছি। টবে বটগাছ, ঝুড়ি নেমে গেছে_এইসব। বনসাই বৃক্ষ যতবার দেখি ততবারই মন খারাপ হয়। একটা বিশাল বৃক্ষকে পঙ্গু বানিয়ে রাখার মানে কী? গত বৃক্ষমেলা থেকে অনেক দাম দিয়ে আমি দুটো বনসাই গাছ কিনলাম। একটা বট আরেকটা তেঁতুল। এই দুই বামুন বৃক্ষকে নুহাশ পল্লীতে নিয়ে এসে বললাম, আজ তোদের বনসাই অবস্থা থেকে মুক্তি দেব। তোরা সাধারণ বৃক্ষের মতো বড় হবি এবং অবশ্যই বলবি_একজন মানুষ আমাদের কষ্ট বুঝতে পেরে মুক্তির ব্যবস্থা করেছেন। তোরা বলবি_মানুষের জয় হোক।

বনসাই গাছ দুটি পুঁতে দিলাম। এক বছরের আগেই তারা স্বাস্থ্যে, সৌন্দর্যে, প্রাণে ঝলমল করে উঠল। তারা এখন আকাশ ছোঁয়ার স্পর্ধা নিয়ে বড় হচ্ছে। আমার নানাবিধ পাগলামির একটি হচ্ছে, এই দুটি গাছের সঙ্গে কথা বলা। কথা বলার নমুনা (বটগাছের সঙ্গে)_

এই তোর অবস্থা কিরে? ঝুড়ি এর মধ্যেই নামিয়ে ফেলেছিস? ঝুড়ি নামানোর মতো অবস্থা তো হয়নি। ঘটনা কী? মালী তোকে ঠিকঠাক যত্ন করছে?

গাছের সঙ্গে তুই তুই করে কেন কথা বলি? জানি না।

গাছের কথা কিছুক্ষণ বন্ধ থাকুক। আবার এই প্রসঙ্গে ফিরে আসব, এখন বিজ্ঞান- কথা। একটা কুকুর দিয়ে শুরু করা যাক। সে ভরপেট খেয়ে উঠোনে শুয়ে আছে। এই মুহূর্তে খাদ্যের সন্ধানে সে যাবে না। এর অর্থ এই না সে তার চারপাশের জগৎ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে। শামুক তা- ই করত। খাওয়া শেষ হলেই খোলসের ভেতর ঢুকে খোলসের মুখ বন্ধ করে দিত। কুকুর তা করছে না। সে বিশ্রাম নিতে নিতেই এদিক- ওদিক তাকাচ্ছে। হঠাৎ কান খাড়া করে দূরের কোনো শব্দ শুনছে। সে তথ্য সংগ্রহ করছে। এই তথ্যের কিছুটা সে তার মস্তিষ্কে জমা করে রাখবে। অনেকটাই ফেলে দেবে। যে প্রাণী যত উন্নত তার তথ্য সংগ্রহ এবং জমা রাখার পদ্ধতিও তত উন্নত। সৌরজগতের সবচেয়ে উন্নত প্রাণী মানুষের তথ্য সংগ্রহের ক্ষমতা বিস্ময়কর। এই তথ্য সংগ্রহের প্রায় সবটাই হলো কৌতূহলের কারণে।

পেনডোরার বাক্সের ঘটনা তো সবার জানা। গল্পটা এ রকম_পেনডোরাকে একটা বাক্স দিয়ে বলা হলো, খবরদার এই বাক্স তুমি খুলবে না। কৌতূহলের কারণে পেনডোরা সেই বাক্স খুলল, বাক্স থেকে বের হলো দুঃখ, কষ্ট, জরা, দুর্ভিক্ষ, ভয়ঙ্কর সব জিনিস। সেই থেকেই এসব পৃথিবীতে আছে। পেনডোরা কৌতূহলী না হলে আজ আমরা সুখে থাকতাম। পেনডোরার গল্পের সঙ্গে আদম- হাওয়ার গল্পের মিল আছে। কৌতূহলের কারণেই হাওয়া গন্ধম ফল খেলেন, নিজের স্বামীকে খাইয়ে পৃথিবীতে নির্বাসিত হলেন। পৃথিবীর গ্লানি, দুঃখ- কষ্ট, জরা- মৃত্যু তাদের স্পর্শ করল। মানুষ তথ্য সংগ্রহ করে, তথ্যগুলো সাজায়, তাদের ভেতরের মিল- অমিল বের করে। মিল- অমিলের পেছনে কী তা বের করার চেষ্টা করে এটাই বিজ্ঞান।

উদাহরণ দেই।

www.BDeBooks.Com

তথ্য
লোহা পানিতে ডুবে যায়, কাঠ ভাসে, তুলা ভাসে, পাখির পালক ভাসে, পিতল ডুবে যায়, পাথর ডুবে যায় ...

তথ্যের বিচার
লোহা, পিতল, পাথর পানিতে ডুবে যায়।
কাঠ, তুলা, পাখির পালক ভাসে।

বিজ্ঞান
পানির চেয়ে ভারী বস্তু ডুবে যাবে, পানির চেয়ে হালকা বস্তু ভেসে থাকবে।
জ্ঞান কিন্তু এইখানেই থেমে থাকবে না। আরও এগুবে। নতুন তথ্য যুক্ত হবে যেমন_

নতুন তথ্য
লোহা পানিতে ডুবে যায়, কিন্তু লোহার তৈরি নৌকা ভাসে।
কেন?
পিতল নদীতে ডুবে যায়, কিন্তু পিতলের কলসি পানিতে ভাসে। কেন?
এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্যে মানবজাতিকে অপেক্ষা করতে হলো। একদিন আর্কিমিডিস স্নানঘরের চৌবাচ্চায় নগ্ন হয়ে স্নান করতে নামলেন। নেমেই উত্তর পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, ঊঁৎবশধ! কথিত আছে তিনি নগ্ন অবস্থায় রাজপথে নেমে গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে লাগলেন, ঊঁৎবশধ! ঊঁৎবশধ! পেয়ে গেছি পেয়ে গেছি।

লেখক হিসেবে আমাকে মাঝে মধ্যে একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। যেমন, আপনার কি মৃত্যুভীতি আছে?
উত্তরে আমি বলি, আমার মৃত্যুভীতি নেই, তবে মৃত্যুর বিষয়ে প্রবল বিদ্বেষ আছে। আমি মোটামুটি এক হাজার বছর বেঁচে তারপর মরতে চাই।
কেন?
কচ্ছপের মতো তুচ্ছ একটি প্রাণী তিনশ, সাড়ে তিনশ বছর বাঁচে আর মানুষের মতো এত ক্ষমতাধর প্রাণী সত্তর- আশি বছরেই শেষ। এর কোনো অর্থ আছে?
এক হাজার বছর বাঁচতে চান কেন?
বিজ্ঞানের মহান আবিষ্কারগুলো দেখে মরতে চাই। পেনডোরার বাক্স থেকে যেসব ভয়ঙ্কর জিনিস বের হয়েছিল বিজ্ঞান সব ক' টাকে আবার বাক্সে ঢোকাবে। সেই বাক্স বিজ্ঞান ধ্বংস করে দেবে। এই দৃশ্য দেখার আমার শখ।
বিজ্ঞান কিছু প্রশ্নের উত্তর দেবে। যেমন আমরা কে? পৃথিবীতে কেন জন্ম নিয়েছি? আমরা কী উদ্দেশ্যে এসেছি?
সৃষ্টির মূল রহস্য বিজ্ঞানই ভেদ করবে। আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণ বিজ্ঞান করবে। ফিলসফি না।
বিজ্ঞানের ছাত্র বলেই হয়তো বিজ্ঞানের প্রতি আমার আস্থা এবং ভরসা সীমাহীন। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান ক্রমেই জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে। তার যাত্রা অনংঃৎধপঃ- এর দিকে। কোয়ান্টাম থিওরি, স্ট্রিং থিওরি সবকিছু আমার মতো সাধারণ মানুষের বোধের বাইরে চলে যাচ্ছে। বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা চলে যাচ্ছে ফিলসফির দিকে। সুফিরা যেমন বলেন, সবই মায়া; বিজ্ঞানও বলা শুরু করেছে, সবই মায়া।
আমি একপর্যায়ে গাছপালার কাছে ফিরে আসব বলেছিলাম, এখন ফিরলাম।
গাছপালা খাদ্যের সন্ধানে যেতে পারে না। তাকে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। সূর্যের আলো তার গায়ে পড়ে। এখান থেকেই সে খাবার তৈরি করে। সে খাদ্যচিন্তা থেকে মুক্ত। মুক্ত বলেই সে তার চিন্তা অন্যদিকে নিতে পারে। তার অনুভূতি আছে। তার সেই অনুভূতির নিয়ন্ত্রকও থাকতে হবে। নিয়ন্ত্রণটা কোথায়?

www.BDeBooks.Com

আমার ভাবতে ভালো লাগে বৃক্ষরাজি অনেক রহস্যই জানে। তার ক্ষমতার সীমাবদ্ধতার কারণে এইসব রহস্য মানুষকে জানাতে পারছে না। মানুষও তার জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণে গাছের কাছ থেকে কিছু জানতে পারছে না। একদিন সীমাবদ্ধতা দূর হবে। বৃক্ষরাজি কথা বলা শুরু করবে। কী অদ্ভুত কাণ্ডই না তখন ঘটবে!
গাছপালা বিষয়ে নবীজী (দ.)- এর একটি চমৎকার হাদিস আছে। তিনি বলছেন, মনে করো তোমার হাতে গাছের একটি চারা আছে। যে- কোনোভাবেই হোক তুমি জেনে ফেলেছ পরদিন রোজ কেয়ামত। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস হয়ে যাবে। তারপরেও গাছের চারাটি তুমি মাটিতে লাগিয়ো।

পাদটীকা
দর্শন হলো একটি অপ্রয়োজনীয় এবং ভুল শাস্ত্র।
_দার্শনিক ইমাম গাজ্জালি

৪
পড়াশোনা
বাংলা শব্দের মজার দ্বৈততা বিষয়ে আগেও লিখেছি। এখন আরেকবার_পড়ার সঙ্গে শোনা। যেন শোনাও পড়ারই অংশ। আমরা যেভাবে পড়ি সেভাবে কি শুনি? সবাই চায় অন্যকে শোনাতে। নিজে শুনতে চায় না। সবচেয়ে বড় উদাহরণ আমি নিজে। ' বৃদ্ধ বোকা সংঘের' আসরে যে কথা বলে তার কথা শুনতেই বিরক্তি লাগে। শুধু আমি মনের আনন্দে কথা বলে যাই। তখন আমার বিরক্তি লাগে না।
একটা বয়স পার হলে মানুষ ' কথা বলা রোগ' - এ আক্রান্ত হয়। এই বয়সটা একেকজনের জন্যে একেক রকম। সাধারণভাবে ষাট। কারণ এই বয়সেই মানুষের কর্মহীন সময়ের শুরু হয়। ষাট থেকে সত্তর এই দশ বছর সব মানুষের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ। মানুষ নাকি এই দশ বছর অর্থপূর্ণ কথা বলে। তার পর থেকেই কথা থেকে সারবস্তু চলে যায়। বাহাত্তরে পা দিলে তো কথাই নেই।
প্রাচীন ভারতে বিদ্যাদানের কাজটা গুরুরা করতেন এই দশ বছর। পুরো বিদ্যাদানের প্রক্রিয়া ছিল কথানির্ভর। গুরু কথা বলতেন, শিষ্য শুনত। বিদ্যাদান প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে দীর্ঘসময় লাগত। একসময় গুরু বলতেন, আমার বিদ্যা যা ছিল সব শেখানো হয়েছে। এখন যাও, স্নান করে এসো। শিষ্য স্নান করে ফিরত। এই স্নান থেকেই এসেছে ' স্নাতক' শব্দ। শিষ্য গ্র্যাজুয়েট হয়েছে।
পাঠক আবার ভেবে বসবেন না যে শিষ্য দীর্ঘ পাঠগ্রহণ প্রক্রিয়া চলাকালীন স্নান করেনি। অবশ্যই স্নান করেছে, তবে শেষ দিনের স্নান হলো স্নাতক হওয়ার স্নান।
আমাদের শিক্ষাগ্রহণ প্রক্রিয়া এখনো শোনানির্ভর। বিজ্ঞানের প্রাকটিক্যাল ক্লাস ছাড়া ছাত্রদের শুধু শুনে যেতে হয়। ধর্মপ্রচারকরাও শিষ্যদের সঙ্গে কথা বলতেন। শিষ্যরা গুরুর কথা শুনত। নবীজি (সা.)- কে আল্লাহর বাণী শোনানো হলো কথায়_' পড়ো! তোমার প্রভুর নামে...'
তাহলে কী দাঁড়াচ্ছে? শোনাটা পড়ার চেয়ে জরুরি? আগে শোনা তারপর পড়া। অর্থাৎ পড়াশোনা না, শোনাপড়া। আমার আতদীয়স্বজনরা মাঝেমধ্যে বেশ আয়োজন করে আমার কথা শুনতে আসেন। তাঁদের ধারণা, আমার কাছ থেকে

www.BDeBooks.Com

শোনা কথাগুলো নাকি ' অতি উত্তম' । তাঁদের কথা শোনানো কঠিন কর্মের মধ্যে পড়ে, কারণ তাঁরা মানসিক প্রস্তুতি নিয়েই আসেন যে ' অতি উত্তম' কথা শুনবেন। মানসিক প্রস্তুতি থাকা মানেই আশাভঙ্গের সম্ভাবনা।

লেখকরা গুছিয়ে কথা বলবেন_এটা নিপাতনে সিদ্ধের মধ্যে পড়ে না। বেশির ভাগ লেখক কথা বলতেই পছন্দ করেন না। তাঁরা আবার কথা শুনতেও পছন্দ করেন না। আমার অতি প্রিয় লেখক এডগার এলেন পো কারো সঙ্গেই কথা বলতেন না। কেউ কথা বলতে এলেও মহাবিরক্ত হতেন।

উল্টোদিকে আছেন চার্লস ডিকেন্স। শুধু তাঁর মুখের গল্প শোনার জন্যে টিকিট কেটে মানুষ হল ভর্তি করে ফেলত। বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীর গ্র্যান্ডমাস্টার আইজাক এসিমভকে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় গেস্ট লেকচার দেওয়ার জন্যে নিয়ে যেত। তিনি বক্তৃতার জন্যে প্রচুর টাকা নিতেন। এক ঘণ্টা কথা বলতেন, এই এক ঘণ্টা দর্শক মুগ্ধ হয়ে থাকত।

আচ্ছা আমি কি গল্প সুন্দর করে বলতে পারি? মনে হয় পারি। কেন বিনয়ের ধারেকাছে না গিয়ে পারি বলে ফেললাম, সেটা ব্যাখ্যা করি। হঠাৎ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণামূলক রচনা পড়তে গিয়ে দেখি তিনি লিখেছেন_

' হুমায়ূন আহমেদ আড্ডায় বসে যেসব চমৎকার গল্প করে সেগুলি রেকর্ড করে রাখা উচিত।...'

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের এই লেখা পড়েই মনে হয় ' অন্যদিন পত্রিকার সম্পাদক মাজহার উৎসাহিত হলো (সে অতি দ্রুত উৎসাহী হওয়ার মতো ক্ষমতা রাখে)। একদিন আড্ডায় গল্প করছি, হঠাৎ দেখি আমার বাঁ পাশে কালো মতো ছোট্ট একটা কী। সেখান থেকে জোনাকিপোকার মতো থেমে থেমে আলো আসছে। আমি বললাম, এটা কী?

মাজহার বলল, স্যার, ভয়েস রেকর্ডার।

ভয়েস রেকর্ডার কেন?

এখন থেকে ঠিক করেছি আমাদের আড্ডার পুরো সময়টা রেকর্ড করা থাকবে।

আমি ঠাণ্ডা গলায় বললাম, এই বস্তু নিয়ে যাও এবং তুমি নিজেও আগামী সাত দিন আড্ডায় আসবে না।

শুরু করেছিলাম পড়াশোনা নিয়ে। চলে এসেছি আড্ডার গল্পে এবং নিজেকে বিরাট কথক হিসেবে প্রমাণ করার চেষ্টা চালাচ্ছি। পাঠক, স্যরি। তবে ফাউনটেনপেন যেহেতু আত্মজীবনিক লেখা, নিজের কথা বলা যেতে পারে। যদিও নিজের প্রশংসা নিজেই করার মতো তুচ্ছ কিছু হতে পারে না। অন্যের নিন্দা করা যত দোষ নিজের প্রশংসা করা তার চেয়েও দোষ। কেউ যখন নিজের প্রশংসা নিজেই শুরু করেন তখন আমার গা চিড়বিড় করতে থাকে।

নিজের প্রশংসা নিজে করার সবচেয়ে খারাপ উদাহরণ ইমদাদুল হক মিলন। গত বইমেলা বিষয়ে তার একটা লেখা কালের কণ্ঠের সাহিত্য পাতায় ছাপা হয়েছে। সে লিখেছে...

তখন আমার একটা বই বাংলা একাডেমী বেস্ট সেলার ঘোষণা করেছে। পাঠক- পাঠিকা বইটির জন্যে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। প্রকাশক চাহিদামতো বই জোগান দিতে পারছে না। বইটির জন্যে বইমেলার অনেক জায়গায় কাটাকাটি মারামারি হচ্ছে...

যখন লেখালেখি করি না, আড্ডা দিতে বসি না, তখন কী করে সময় কাটাই? এই প্রশ্ন কিছুদিন আগে টেলিফোনে এক সাংবাদিক করলেন। আমি বললাম, তখন আমি একটা কাঁচি নিয়ে বসি। কাঁচি দিয়ে কেটেই সময় কাটাই।

সাংবাদিক আমার কথায় আহত হয়ে টেলিফোন রেখে দিলেন। তাঁর জানার জন্যে এবং পাঠকদের জানার জন্যে বলি_তখন আমি সিনেমা দেখি এবং পড়ি। আমার কাছে মোটা একটা বই আছে। বইয়ের নাম

। বই দেখে দেখে ভিডিওর দোকান থেকে ফিল্ম আনি। ছবি দেখার পর বই থেকে নামটা কেটে দিই।

বইয়ে নাম নেই এমন ছবিও দেখা হয়। বলতে ভুলে গেছি, আমি নিজে এক হাজার একটি বইয়ের তালিকা প্রস্তুত করছি। যে বইগুলো মৃত্যুর আগে অবশ্যই পড়া উচিত। একটি বই পড়তে তিন দিন লাগলে ১০০১টি বই পড়তে লাগবে মাত্র দশ বছর।

পৃথিবীর সব লেখকের দোষগুলো আমার মধ্যে আছে। একটা গুণও আছে। আমিও লেখকদের মতো প্রচুর বই পড়ি। একসময় গল্প- উপন্যাস পড়তাম। এখন জানি না কেন গল্প- উপন্যাস পড়তে ভালো লাগে না। বই সবচেয়ে বেশি পড়ি

www.BDeBooks.Com

যখন দেশের বাইরে যাই।

বিদেশ যাত্রার প্রস্তুতি হিসেবে আমার দুটি স্যুটকেস গোছানো হয়। একটায় থাকে কাপড়চোপড়। এটা শাওন গোছায়। আরেকটায় থাকে books বাংলায় ' পাঠবস্তু' । দুই মাস আগে মিসরের পিরামিড দেখার ব্যবস্থা হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত যাওয়া বাতিল হয়েছে। স্যুটকেস গোছানোই আছে।

সেখানে কী কী বই নেওয়া হয়েছে তার তালিকা দিচ্ছি_

১. একটা রাশিয়ান সায়েন্স ফিকশন। আগরতলা বইমেলা থেকে একগাদা সায়েন্স ফিকশন কিনেছিলাম। একটাও পড়া হয়নি। যখনই বাইরে যাই একটা রাশিয়ান সায়েন্স ফিকশনের বই নিয়ে যাই। কেন জানি কখনো পড়া হয় না।

২. মার্কোপোলোর ভ্রমন কাহিনি। এ বইটি আমি আগে একবার পড়েছি। আবারও সঙ্গে নিচ্ছি কারণ মার্কোপোলোর গাঁজাখুরি ভ্রমণকাহিনী পড়তে ভালো লাগে।

সচেতন পাঠক নিশ্চয় ভুরু কুঁচকাচ্ছেন। মার্কোপোলোর ভ্রমণকাহিনীকে আমি গাঁজাখুরি বলছি। কারণ ব্যাখ্যা করি। তিনি ভারতবর্ষে (বর্ণনা শুনে মনে হয় বাংলাদেশ) এক দল মানুষ দেখেছেন, যাদের মুখ কুকুরের মতো। এরা কুকুরের মতোই ডাকে।

এই বাংলাদেশেই আরেক দল মানুষ দেখেছেন যারা প্রকাশ্যে যৌনসঙ্গম করে। এতে কোনো লজ্জা বোধ করে না।

তিনি চীন ভ্রমণের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন, কিন্তু গ্রেট চায়নিজ ওয়াল তাঁর চোখে পড়েনি।

৩. বিজ্ঞানের বই। ' সময়' কী তা ব্যাখ্যা করা। সহজপাঠ্য।

৪. কার্ল সেগান আমার অতি পছন্দের লেখকদের একজন। তাঁর লেখা একটি বই আমি একসঙ্গে দুটি কপি কিনেছিলাম যাতে একটি হারিয়ে গেলে অন্যটি থাকে। হায় খোদা, দুটিই হারিয়েছে!

৫. বাংলা একাডেমীর প্রকাশনা বাবুরনামা। এই বইটিও আগে ইংরেজিতে পড়া। আবারও পড়ছি, কারণ একটা ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখার বাসনা আছে। সম্রাট হুমায়ুনকে নিয়ে উপন্যাস। নাম দেব ' বাদশাহ নামদার' । হুমায়ুন প্রসঙ্গে যেখানে যা পাচ্ছি পড়ে ফেলছি।

কী আশ্চর্য! একের পর এক বইয়ের নাম লিখে যাচ্ছি কেন? আমি স্যুটকেসে কী সব বই ভরেছি তা পাঠকদের জানানোর প্রয়োজন কি আছে?

আছে। কী ধরনের বই আমি পড়তে পছন্দ করি, কেন করি_তা জানানো।

আমি নানা ধর্মগ্রন্থ ঘেঁটেছি একটা বিষয় জানার জন্যে_বেহেশত বা স্বর্গে কি কোনো লাইব্রেরি থাকবে? সুখাদ্যের বর্ণনা আছে, অপূর্ব দালানের কথা আছে, উৎকৃষ্ট মদ্যের কথা আছে, রূপবতী তরুণীর কথা আছে, বহুমূল্য পোশাকের কথা আছে, সংগীতের কথা আছে। লাইব্রেরির কথা নেই।

লাইব্রেরি হচ্ছে মানুষের চিন্তা এবং জ্ঞানের ফসল। বেহেশতে হয়তো মানুষের চিন্তা ও জ্ঞানের প্রয়োজন নেই। সেখানকার চিন্তা অন্য, জ্ঞান অন্য। বিশুদ্ধ চিন্তা, বিশুদ্ধ জ্ঞান।

অবশ্যপাঠ্য বইয়ের প্রথম তালিকা।

লেখক : বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

লেখা_১. পথের পাঁচালী

২. দৃষ্টি প্রদীপ

৩. আরণ্যক

৪. ইছামতী

৫. দেবযান

www.BDeBooks.Com

৫.
হাসপাতাল

ঢাকার বক্ষব্যাধি হাসপাতালের একটি কেবিন।
কবি শামসুর রাহমান শুয়ে আছেন। তাঁর নাকে অক্সিজেনের নল, গায়ে হাসপাতালের পোশাক নেই। লুঙ্গি- গেঞ্জি পরে শুয়ে আছেন। গেঞ্জি গলা পর্যন্ত ওঠানো বলে কবির বুক যে হাপরের মতো ওঠানামা করছে, তা দেখা যাচ্ছে। কবি চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছেন। তাঁর দৃষ্টিতে প্রাণের স্পর্শ নেই।
হাসপাতালের ওই কেবিনে আমার সঙ্গে আছেন সৈয়দ শামসুল হক এবং দৈনিক বাংলার সহ- সম্পাদক সালেহ চৌধুরী। আরো কেউ কেউ হয়তো ছিলেন, তাঁদের নাম মনে করতে পারছি না। আমরা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে কবির রোগযন্ত্রণা দেখছি, হঠাৎ সৈয়দ শামসুল হক নৈঃশব্দ ভঙ্গ করলেন। তিনি কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, ' কবি, আপনাকে বাঁচতেই হবে। আমি আমার থেকে খানিকটা আপনাকে দিলাম।'
ঘোষণায় নাটকীয়তা ছিল, আবেগ ছিল; যুক্তি ছিল না। একজন তাঁর আয়ুর খানিকটা অন্যকে দিতে পারেন না। বাংলাদেশের সব মানুষ এক মিনিট করে আয়ু কবিকে দান করলে কবি বেঁচে থাকতেন তিন শ বছর।
তবে মোগল সম্রাট বাবর তাঁর পুত্র হুমায়ুনকে নিজের আয়ু দান করেছিলেন। ঘটনাটা এ রকম_হুমায়ুন মৃত্যুশয্যায়। চিকিৎসকদের সব চিকিৎসা ব্যর্থ। এ সময় সুফি দরবেশ মীর আবুল কাশেম সম্রাটকে বললেন, আপনি আপনার জীবনের একটি অতি প্রিয় জিনিসের বিনিময়ে পুত্রের জীবন ভিক্ষা করতে পারেন। এটা হবে শেষ চেষ্টা।
সম্রাট বাবর বললেন, আমার সবচেয়ে প্রিয় জিনিস হলো নিজ জীবন। এর বিনিময়ে আমি পুত্রের জীবন ভিক্ষা চাইব।
মীর আবুল কাশেম আঁতকে উঠে বললেন, কী সর্বনাশ! নিজের জীবন না, আপনি বরং বহুমূল্যবান কোহিনূর হীরা দান করে দিন।
সম্রাট বললেন, আমার পুত্রের জীবন কি সামান্য হীরকখণ্ডের তুল্যমূল্য?
আমি আমার জীবনের বিনিময়ে পুত্রের জীবন ভিক্ষা চাইব।
সম্রাট তিনবার পুত্রের চারপাশে ঘুরতে ঘুরতে প্রার্থনা করলেন। তিনবার বললেন, পুত্র, তোমার সমস্ত ব্যাধি আমি নিজ দেহে তুলে নিলাম। পরম করুণাময়, আমার প্রার্থনা কবুল কর।
হুমায়ুন অবচেতন অবস্থা থেকে চেতন অবস্থায় এসে পানি খেতে চাইলেন আর বাবর হলেন অসুস্থ।
আমার নিজের জীবনেও এ রকম একটা ঘটনা আছে। আমার ছেলে রাশেদ হুমায়ূনের বয়স দুই দিন। তাকে ইনকিউবেটরে রাখা হয়েছে। সে মারা যাচ্ছে। আমি হাসপাতাল থেকে শহীদুল্লাহ হলের বাসায় ফিরে এলাম। অজু করে জায়নামাজে দাঁড়ালাম। আমি ঠিক করলাম, সম্রাট বাবরের মতো নিজের জীবনের বিনিময়ে পুত্রের প্রাণ ভিক্ষা করব। জায়নামাজে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হলো, এই প্রার্থনা কবুল হবে।
শেষ মুহূর্তে প্রবল ভীতি আমাকে আচ্ছন্ন করল। আমি জীবনের বিনিময়ে জীবনের প্রার্থনা করতে পারিনি। আমি আমার মৃত শিশুপুত্রের কাছে লজ্জিত এবং ক্ষমাপ্রার্থী।
নুহাশ পল্লীর ঔষধি উদ্যানে একটি স্মৃতিফলক আছে_ ' রাশেদ হুমায়ূন ঔষধি উদ্যান' । তার নিচে লেখা_ ' আমার ছোট্ট বাবাকে মনে করছি' ।
আমার শিশুপুত্র তিন দিনের আয়ু নিয়ে অদ্ভুত সুন্দর পৃথিবীতে এসেছিল। সে এই সৌন্দর্যের কিছুই দেখেনি। আমি প্রায়ই নিজেকে এর জন্য দায়ী করি।
থাকুক পুরনো কথা, হাসপাতালের অন্য গল্প করি।
গল্প- ১
স্থান : হৃদরোগ ইনস্টিটিউট, শেরেবাংলা নগর।
আমার বড় ধরনের হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। ভর্তি হয়েছি হাসপাতালে। নানান যন্ত্রপাতি এবং মনিটর শরীরে লাগানো। আমার

www.BDeBooks.Com

বড় ছেলে নুহাশ আমাকে দেখতে এসেছে। নুহাশের বয়স পাঁচ। সে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মনিটরের দিকে। মনিটরে ঢেউয়ের মতো রেখা দেখা যাচ্ছে।

নুহাশ বলল, বাবা, এখানে কী হচ্ছে, আমি জানি।

কী হচ্ছে?

এই যে ঢেউয়ের মতো রেখাগুলো দেখছ, একসময় রেখা সমান হয়ে স্ট্রেইট লাইন হবে। তখন তুমি মারা যাবে।

আমি বললাম, ও!

নুহাশ গভীর আগ্রহ নিয়ে মনিটর দেখছে। কখন স্ট্রেইট লাইন হবে, কখন তার বাবা মারা যাবে, এই প্রতীক্ষা।

গল্প- ২

স্থান : বেলিভিউ হাসপাতাল, নিউইয়র্ক।

আমার এনজিওগ্রাম করা হবে। পায়ের ধমনি কেটে একটা সুই ঢুকিয়ে দেওয়া হবে। সেই সুই চলে যাবে হৃৎপিণ্ডে। আমাকে বলা হয়েছে, এই পদ্ধতিতে প্রতি এক হাজারে একজন মারা যায়। আমি কাগজপত্রে সই করে জানিয়েছি, মৃত্যু হলে দায়- দায়িত্ব হাসপাতালের না, আমার।

অপারেশন হবে ভোর ন' টায়। আগের রাতে আমার কাছে হাসপাতালের একজন কাউন্সিলর এলেন। তিনি বললেন, তুমি কি মুসলিম?

হ্যাঁ।

কাল ভোরে তোমার অপারেশন। তুমি কি চাও তোমার জন্য তোমার ধর্মমতে প্রার্থনা করা হোক?

তার মানে কী?

এই হাসপাতালে রোগীদের জন্য প্রার্থনার ব্যবস্থা আছে। প্রার্থনার জন্য আলাদা ফি আছে। তুমি ফির ডলার জমা দিলেই প্রার্থনার ব্যবস্থা হবে।

হাসপাতাল হলো চিকিৎসার জায়গা। প্রার্থনার জায়গা_ এটা জানতাম না।

কাউন্সিলর বললেন, সমীক্ষায় দেখা গেছে, যাদের জন্য প্রার্থনা করা হয়, তাদের আরোগ্যের হার বেশি। এ জন্যই প্রার্থনা বিভাগ খোলা হয়েছে।

আমি প্রার্থনা করাব না। অর্থের বিনিময়ে প্রার্থনায় আমার বিশ্বাস নেই।

তোমার অপারেশনটি জটিল। তুমি যদি চাও আমি ডিসকাউন্টে প্রার্থনার জন্য সুপারিশ করতে পারি। একজন মুসলমান আলেম প্রার্থনা করবেন।

ডিসকাউন্টের প্রার্থনায়ও আমার বিশ্বাস নেই।

তুমি কি নাস্তিক?

আমি নাস্তিক না বলেই ডিসকাউন্টের প্রার্থনায় বিশ্বাসী না।

ভোর ন' টায় এনজিওগ্রাম শুরু হলো। ডাক্তার একজন অল্পবয়সী তরুণী। আমেরিকান না, ভারতীয় তরুণী। সে কিছু একটা গণ্ডগোল করল। ধমনি ফেটে রক্ত ছিটকে বের হয়ে আমার সামনের মনিটরে পড়ল। ডাক্তারের চোখেমুখেও পড়ল। আমি ইংরেজিতে জানতে চাইলাম, কোনো সমস্যা কি হয়েছে?

তরুণী বলল, শান্ত থাকো। আমাকে শান্ত থাকতে বলে সে যথেষ্টই অশান্ত হয়ে পড়ল। একটা পর্যায়ে তাকে সাহায্য করার জন্য অন্য ডাক্তার চেয়ে পাঠাল। আমি মনে মনে বললাম, ডিসকাউন্টের প্রার্থনা নেওয়াই মনে হয় উচিত ছিল।

গল্প- ৩

স্থান : মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতাল, সিঙ্গাপুর।

মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালে চতুর্থবারের মতো আমার এনজিওগ্রাম করা হয়েছে। রাতটা হাসপাতালের কেবিনে কাটাতে হবে। পরদিন ছুটি। খরচ কমানোর জন্য সিঙ্গেল কেবিন না নিয়ে ডাবল কেবিন নিয়েছি। আমার পাশে আরেকজন অতি বৃদ্ধ চায়নিজ রোগী। দু' জনের মাঝখানে পর্দা আছে। পর্দার ফাঁক দিয়ে আমি বৃদ্ধ রোগীকে দেখতে পাচ্ছি।

www.BDeBooks.Com

রোগীর অবস্থা শোচনীয়। তাঁর মুখে বেলুনের মতো কী যেন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। নিঃশ্বাস- প্রশ্বাসের সঙ্গে বেলুন ফুলছে এবং সংকুচিত হচ্ছে। অনেকটা ব্যাঙের গলার ফুলকার মতো। রোগী ঘড়ঘড় শব্দ করছে। ভয়ঙ্কর রকম আহত জন্তু হয়তো বা এ রকম শব্দ করে।

রোগীকে দেখার জন্য একের পর এক তাঁর আতদীয়- স্বজন আসছে। কিছুক্ষণ কেঁদে স্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে। অনেককে দেখলাম রোগীর বালিশের নিচে টাকা গুঁজে দিচ্ছে। দর্শনার্থীরা কেউ কেউ বাচ্চা নিয়ে আসছে। বাবা- মা বাচ্চাদের উঁচু করে রোগীকে দেখাচ্ছে। অনেকটা শেষ দেখার মতো। কুমিরের বাচ্চার মতো দেখানো শেষ হওয়া মাত্র বাচ্চাগুলোকে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে আমার দিকে। এরা শুরু করে কিচিরমিচির। কেউ কেউ চেষ্টা করে আমার বিছানায় উঠতে। একসময় মধ্য বয়স্ক এক মহিলা এসে বিনয়ে নিচু হয়ে আমাকে জানাল, তার দাদা মারা যাচ্ছেন বলে সবাই দেখতে আসছে। আমাকে যন্ত্রণার ভেতর দিয়ে যেতে হচ্ছে বলে তাদের লজ্জার সীমা নেই। আমি যেন ক্ষমা করে দেই।

রাত ১০টায় নার্স আমার জন্য ওষুধ নিয়ে এল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ওই বৃদ্ধের কী হয়েছে?

নার্স বলল, বার্ধক্য ব্যাধি।

অবস্থা কি খারাপ?

যথেষ্টই খারাপ। ঘটনা রাতেই ঘটবে।

আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, কেউ রাতে মারা গেলে তার ডেডবডি কি তোমরা সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে যাও, না পরে নাও?

অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা হয়।

আমি বললাম, আমি মৃত মানুষ পাশে নিয়ে কখনো শুয়ে থাকিনি। আমাকে কি অন্য একটা কেবিনে দেওয়া যাবে?

নার্স বলল, অবশ্যই যাবে। তুমি ওষুধ খাও, আমি ব্যবস্থা করছি।

আমি ওষুধ খেলাম। নিশ্চয়ই কড়া কোনো ঘুমের ওষুধ। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম ভাঙল ভোরবেলা। আমি আমার নিজের কেবিনেই আছি। পর্দার ওপাশে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। কোনো শব্দও নেই। সুনসান নীরবতা। ঘটনা নিশ্চয়ই ঘটে গেছে।

আমি অতি কষ্টে বিছানা থেকে নামলাম। উঁকি দিলাম পাশের বিছানায়। বৃদ্ধ হেলান দিয়ে আধশোয়া হয়ে বসে আছে। বৃদ্ধের মুখ হাসি হাসি। সে চামচ দিয়ে স্যুপ খাচ্ছে।

আমাকে দেখে বলল, গুড মর্নিং।

আমি বললাম, গুড মর্নিং।

বৃদ্ধ হাত ইশারা করে আমাকে কাছে ডাকল। বিড়বিড় করে চায়নিজ ভাষায় কী যেন বলল। আমি কাছে এগিয়ে গেলাম। বৃদ্ধ বালিশের নিচে হাত দিয়ে ১০০ সিঙ্গাপুর ডলারের একটা নোট আমার দিকে বাড়িয়ে বলল, টেক টেক টেক। মনে হয়, জীবন ফিরে পেয়ে সে মহা আনন্দিত। এই আনন্দের খানিকটা ভাগ আমাকে দিতে চায়। (পাঠকদের কী ধারণা_আমি কি বৃদ্ধের উপহার নিয়েছি, নাকি নেইনি? কুইজ।)

পাদটীকা- ১

এবার ইউরোপের অতি উন্নত একটি দেশের অদ্ভুত চিকিৎসার গল্প। দেশটির নাম সুইডেন। সেই দেশে বাঙালি এক মহিলা দাঁতের সমস্যা নিয়ে গেছেন। দাঁতের ডাক্তার পরীক্ষা করে আঁতকে উঠে বললেন, দাঁতের গোড়ায় ভয়ঙ্কর এক জীবাণু পাওয়া গেছে। এই জীবাণু হার্টে চলে যাওয়া মানে হার্ট ফেলিউর। তিনি ব্যবস্থা দিলেন, রোগীর সব দাঁত জরুরি ব্যবস্থায় তুলে ফেলতে হবে। মহিলা শুরু করলেন কান্না। মহিলার মেয়ে একজন ডাক্তার। সে মাকে বলল, মা, তোমার চিকিৎসা হচ্ছে সুইডেনে, এত ভালো চিকিৎসা কোথাও হবে না। দাঁত ফেলতে বলছে ফেলে দাও।

বেচারির সব সুস্থ দাঁত টেনে তুলে ফেলে দেওয়া হলো। তাঁকে ভর্তি করা হলো ভয়ঙ্কর জীবাণুর চিকিৎসা যে হাসপাতালে হয়, সেখানে। ডাক্তাররা ভয়ঙ্কর জীবাণুর সন্ধানে লেগে গেলেন। একসময় ঘোষণা করলেন, এই জীবাণুর কোনো অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। ভুল হয়েছে। ভুলের কারণেই সব দাঁত ফেলা হয়েছে। তারা দুঃখিত।

www.BDeBooks.Com

ভদ্র মহিলা হচ্ছেন নির্বাসিতা লেখিকা তসলিমা নাসরিনের মা। তসলিমা নাসরিন মাকে চিকিৎসা করাতে সুইডেনে নিয়ে গিয়েছিলেন।

পাদটীকা- ২
আমি কখনোই মনে করি না, মানুষ এমন কোনো অপরাধ করতে পারে, যার শাস্তি তার কাছ থেকে দেশ কেড়ে নেওয়া। মানুষ মানুষকে ত্যাগ করে; দেশ কখনো তার সন্তানকে ত্যাগ করে না। যাঁরা তসলিমা নাসরিনের রচনা পছন্দ করেন না, তাঁরা পড়বেন না। তসলিমা নাসরিন যদি বিভ্রান্ত হয়ে থাকেন, তিনি থাকবেন তাঁর বিভ্রান্তি নিয়ে। আমরা কেন তাঁকে দেশছাড়া করব? কেন বাংলাদেশের একটা মেয়ে ভবঘুরের মতো এক দেশ থেকে আরেক দেশ ঘুরবে? ভয়ঙ্কর সব যুদ্ধাপরাধীরা তো ঠিকই বাংলাদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমরা তো তাদেরকে দেশান্তরী করি না।

৬.
চ্যালেঞ্জার

কী এক উৎসব উপলক্ষে আমরা অর্থাৎ ওল্ড ফুলস ক্লাবের সদস্যরা একটা হোটেলের বড় ঘরে জড়ো হয়েছি। সেখানে মধ্যবয়স্ক অচেনা এক ব্যক্তি ঢুকল। আমি ভুরু কুঁচকে তাকালাম। বৃদ্ধ বোকা সংঘের আড্ডায় কখনো অপরিচিতজনদের আসতে দেওয়া হয় না। এ কে? এখানে কী চায়?
পরিচয়ে জানলাম_তার একটা প্রেস আছে। সেই প্রেসে মাজহারদের ' অন্যপ্রকাশ' - এর বইয়ের কভার মাঝেমধ্যে ছাপা হয়। সে মাজহারের কাছে এসেছে, তার কিছু টাকা দরকার।
বেচারা বিব্রত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। আমি বললাম, আপনি বসুন।
সে সংকুচিত ভঙ্গিতে বসল।
আড্ডা জমে উঠল। আমি তার কথা ভুলেই গেছি। নিজের মনে কথা বলে যাচ্ছি। হঠাৎ সে বলল, এখন আপনি যে যুক্তিটা দিলেন তাতে ভুল আছে।
আমি বললাম, কী ভুল?
সে আমার যুক্তির ভুল ব্যাখ্যা করল। আমি কিছুক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে বললাম, আপনার কী নাম?
স্যার, আমার নাম সাদেক।
আপনি এত পেছনে কেন? কাছে এগিয়ে আসুন। সাদেক কাছে এগিয়ে এল। এই আসরেই তার নতুন নাম করা হলো ' চ্যালেঞ্জার' ।
তার নামকরণে আমার কোনো ভূমিকা ছিল না। নামকরণ করেছিলেন অবসর প্রকাশনার মালিক আলমগীর রহমান। সাদেক আলমগীর রহমানের দিকে একটা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে চ্যালেঞ্জ জিতে নেন বলেই নাম চ্যালেঞ্জার। চ্যালেঞ্জার কী বিষয়ে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন তা বলতে চাইছি না। কোনো এক বিশেষ তরল পদার্থ গলাধঃকরণবিষয়ক চ্যালেঞ্জ। ধরা যাক পেপসি। আলমগীর আট বোতল পেপসি খেয়ে বমি শুরু করল। চ্যালেঞ্জার নয় বোতল খেয়ে স্বাভাবিক ভঙ্গিতে সবার দিকে তাকিয়ে

www.BDeBooks.Com

হাসতে লাগল, যেন কিছুই হয়নি।

তাকে আমি প্রথম যে নাটকে নিলাম তার নাম ' হাবলার বাজার ' । নাটকের কাহিনী হচ্ছে_গরমের সময় ডাক্তার এজাজের মাথা এলোমেলো হয়। তার বিয়ের দিন মাথা খুব এলোমেলো হলো। ঠিক করা হলো, মাথা কামিয়ে সেখানে এলাজ দেওয়া হবে। শর্ট নেওয়ার আগে আগে দেখা গেল নাপিত আনা হয়নি।

কিভাবে নাটক বানানো হয় তা দেখার জন্য চ্যালেঞ্জার তার স্ত্রীকে নিয়ে গেছে। দুজনই আগ্রহ নিয়ে নাটক বানানো দেখছে। আমি চ্যালেঞ্জারের দিকে তাকিয়ে বললাম_তুমি তো সব কিছুতেই চ্যালেঞ্জ হিসেবে নাও। এসো নাপিতের ভূমিকায় অভিনয় করো।

চ্যালেঞ্জার বলল, স্যার আপনি যা বলবেন তা- ই করব। মাটি খেতে বললে মাটি খাব। নাটক পারব না।

আমি বললাম, তুমি পারবে। নাও ক্ষুর হাতে নাও।

চ্যালেঞ্জার ছোট্ট একটা ভূমিকায় অভিনয় করল। আমি সঙ্গে সঙ্গে বুঝলাম, তার ভেতর সহজাত অভিনয়ের আশ্চর্য ক্ষমতা আছে।

তাকে এক ঘণ্টার একটি নাটকে প্রধান চরিত্র করতে বললাম, নাটকের নাম ' খোয়াবনগর' । সেখানে আমার মেজো মেয়ে শীলা অভিনয় করেছিল। নাটকের শেষে আমি মেয়েকে জিজ্ঞেস করলাম, বাবা! চ্যালেঞ্জার নামের এই নতুন অভিনেতার অভিনয় তোমার কেমন লাগল?

শীলা বলল, আসাদুজ্জামান নূর চাচাকে আমার এ দেশের সবচেয়ে বড় অভিনেতা বলে মনে হয়। আমি আজ যাঁর সঙ্গে অভিনয় করলাম, তিনি নূর চাচার চেয়ে কোনো অংশে কম না।

বাবা! তোমার কী মনে হয় সুপারস্টার হিসেবে তার পরিচয় হবে?

শীলা বলল, অবশ্যই।

' উড়ে যায় বকপক্ষী' তে পাগলের ভূমিকায় অভিনয় করে চ্যালেঞ্জার নিজেকে সুপারস্টার প্রমাণিত করল।

আমি কোনো অবিচুয়ারি লিখছি না। চ্যালেঞ্জার এখনো জীবিত। আজ দুপুরে সে তার স্ত্রীকে ইশারায় বলল, সে আমাকে দেখতে চায়।

তার স্ত্রী তাকে নিয়ে বাসায় উপস্থিত হলো। দুজন দুজনের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। তার কথা বলার ক্ষমতা নেই। যে কথা বলতে পারছে না, তার সঙ্গে কথা বলে তার যন্ত্রণা বাড়ানোর কোনো মানে হয় না।

চ্যালেঞ্জার সম্পর্কে দুটি ছোটগল্প বলতে ইচ্ছা করছে।

গল্প- ১

আমি আমার মেয়ে বিপাশা এবং পুত্র নূহাশকে নিয়ে কক্সবাজার গিয়েছি। তখন আমি মূল পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন। একা বাস করি। আমার এই দুই পুত্র- কন্যা হঠাৎই ঠিক করল, বাবার সঙ্গে কিছু সময় কাটাবে। কাজেই তাদের নিয়ে এসেছি সমুদ্রের কাছে। উঠেছি হোটেল সায়মনে। খুব ভোরবেলা দরজায় নক হচ্ছে। দরজা খুললাম, অবকা হয়ে দেখি, এক কাপ গরম চা এবং খবরের কাগজ হাতে চ্যালেঞ্জার দাঁড়িয়ে আছে। সে আমাকে সারপ্রাইজ দেওয়ার জন্য সারা রাত গাড়ি চালিয়ে ঢাকা থেকে চলে এসেছে।

গল্প- ২

দখিন হাওয়ার ফ্ল্যাটে আমি একা থাকি। শীলার মায়ের সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হওয়ার কারণে ওল্ড ফুলস ক্লাবের সব সদস্য আমাকে ত্যাগ করেছে। কেউ ফ্ল্যাটে আসে না। হঠাৎ কারো সঙ্গে দেখা হলে তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়। অদ্ভুত ভঙ্গিতে অন্যদিকে তাকিয়ে থাকে। আমার সেই দুঃসময়ের কাল বেশ দীর্ঘ ছিল। তখন প্রতিদিন দুপুরে এবং রাতে চ্যালেঞ্জার এসে বসে থাকত। সে আমার সঙ্গে খাবে। তার একটাই যুক্তি। ' স্যার, আপনি একা খেতে পছন্দ করেন না। আমি কখনোই আপনাকে একা খেতে দেব না।' এক সময় ওল্ড ফুলস ক্লাবের সদস্যরা আসতে শুরু করল। চ্যালেঞ্জার দূরে সরে গেল। চ্যালেঞ্জারের নিজের একটা গল্প বলি। সে ইন্টারমিডিয়েট পড়ার সময় তার সৎমায়ের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ছোট ছোট ভাইবোন নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে এসেছিল। তার নিজের ভাষ্যমতে, ' স্যার, কতদিন গিয়েছে কোনো খাওয়া নাই।

www.BDeBooks.Com

গ্লাসভর্তি চা নিজে খেয়েছি। ভাইবোনদের খাইয়েছি।' বড় ভাইয়ের দায়িত্ব সে পুরোপুরি পালন করেছিল, সব ভাইবোনকে পড়াশোনা করিয়েছে, বিয়ে দিয়েছে। তার চেয়েও অদ্ভুত কথা সে তার সৎমাকে নিজের কাছে এনে যতটুকু আদর- যত্ন করা যায় করেছে। মৃত্যুর সময় এই মহিলা তার সৎ ছেলের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন।

চ্যালেঞ্জার এখন জম্বী। তাকিয়ে থাকা ছাড়া কিছু করার নেই। ব্রেইন ক্যানসার নামক কালান্তক ব্যাধি তার কাছ থেকে সব কিছু নিয়ে নিয়েছে। বাংলাদেশের মানুষ সাহায্যের হাত গাঢ় মমতায় তার দিকে বাড়িয়েছে বলেই সে এখনো বেঁচে আছে। সাহায্যের নামে কেউ কেউ প্রতারণাও করেছেন। চ্যানেল আইয়ের ক্যামেরার সামনে বড় বড় ঘোষণা দিয়েছেন। তাদের নাম প্রচারিত হয়েছে_এই পর্যন্তই।

এ প্রসঙ্গে আমি দেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে একটি আন্তরিক ধন্যবাদ দিতে চাই। তাঁকে আমি একটি ব্যক্তিগত চিঠি লিখে জনাব আসাদুজ্জামান নূরের হাত দিয়ে পাঠাই। তিনি সঙ্গে সঙ্গেই সরকারি সাহায্যের ব্যবস্থা করেন। আল্লাহ তাঁর মঙ্গল করুন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে লেখা ব্যক্তিগত পত্রটি সংযুক্ত হলো।

৫ আগস্ট, ২০০৯
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
দেশরত্ন শেখ হাসিনা
শ্রদ্ধাভাজনেষু,
আমার বিনীত সালাম গ্রহণ করুন।

আপনি প্রচুর বইপত্র পড়েন_এই তথ্য আমার জানা আছে। নাটক- সিনেমা দেখার সুযোগ পান কি না জানি না। সুযোগ পেলে চ্যালেঞ্জার নামের একজন শক্তিমান অভিনেতার অভিনয় আপনার দেখার কথা। অতি অল্প সময়ে সে অভিনয় দিয়ে দেশবাসীর হৃদয় হরণ করেছে।

বর্তমানে সে মস্তিষ্কের ক্যানসারে আক্রান্ত। তার চিকিৎসা চলছে সিঙ্গাপুরের মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালে। চিকিৎসার বিপুল ব্যয়ভার তার পরিবার আর নিতে পারছে না।

আমি তার হয়ে আপনার কোমল মানবিক সত্তার কাছে আবেদন করছি। আপনার মঙ্গলময় হাত কী এই শক্তিমান অসহায় অভিনেতার দিকে প্রসারিত করা যায়?

বিনীত
হুমায়ূন আহমেদ

www.BDeBooks.Com

৭
জ্বীন এবং পক্ষীকথা

নুহাশ পল্লীর মাঠে বসে আছি। সময় সকাল ১০টা। আমার সঙ্গে আছেন সিলেটের হ্যারল্ড রশীদ। তিনি একজন সংগীত পরিচালক, চিত্রকর এবং শখের জ্যোতির্বিদ। তিনি আমাকে বৃহস্পতির চাঁদ এবং শনিগ্রহের বলয় দেখাতে এসেছেন। নিজের টেলিস্কোপ নিয়ে এসেছেন। রাতে টেলিস্কোপ সেট হবে।

আমরা রাতের জন্য অপেক্ষা করছি। অপেক্ষার জায়গাটা সুন্দর। বেদি দেওয়া জাপানি বটগাছের নিচে বসেছি। আমাদের ঘিরে আছে ছয়টা চেরিগাছ। দুইটাতে ফুল ফুটেছে। নীল রঙের স্নিগ্ধ ফুল। চারদিকে নানান ধরনের পাখি ডাকছে। পাখির বিষয়ে আমার তেমন আগ্রহ নেই। সব পাখি চিনিও না। তাদের কিচিরমিচিরে ভোরবেলা জেগে উঠতে হয়। কাঁচা ঘুম ভাঙানোয় এদের ওপর খানিকটা রাগও করি। দুইটা কাঠঠোকরা পাখি আমাকে ভোরবেলায় অস্থির করে তোলে। এরা কাঠের ইলেকট্রিক পোলে গর্ত করে বাসা বানিয়েছে। সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এরা বাসা থেকে বের হয়। আমি যে ঘরে ঘুমাই তার কাঁচের জানালায় ঠোকর দেয়। মনে হয় জানালা ফুটো করতে চায় কিংবা আয়নায় নিজেকে দেখতে চায়। আরেকটি সম্ভাবনা আছে_হয়তো এদের ঠোঁট কুট কুট করে। প্রচণ্ড শক্তিতে গ্লাসে ধাক্কা দিলে ঠোঁটে আরাম হয়।

পাখি দুইটির বজ্জাতির গল্প হ্যারল্ড রশীদের সঙ্গে করলাম। তিনি বললেন_আচ্ছা, আপনার নুহাশ পল্লীতে এত পাখি, আপনি কি কখনো এখানে মৃত পাখি দেখেছেন?

আমি বললাম_পাখির বাসা থেকে পড়ে মরে গেছে এমন দেখেছি।

পূর্ণবয়স্ক মৃত পাখি?

আমি বললাম_না।

পূর্ণবয়স্ক মৃত পাখি যে কোথাও দেখা যায় না এই বিষয়টা আমি জানি। অনেক বছর আগে একটি পত্রিকায় একটা লেখা পড়েছিলাম সেখানেও মৃত পাখির বিষয়টাকে রহস্য বলা হয়েছে।

হ্যারল্ড রশীদ দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে বললেন মৃত পাখিদের জ্বিন খেয়ে ফেলে, তাই আমরা মৃত পাখি দেখি না। বলেন কি!

জ্বীনের খাবার হলো হাড়। পাখির হাড় তারা খেয়ে ফেলে।

হ্যারল্ড রশীদের কথা গসপেল মনে করার কোনো কারণ নেই। আমি সঙ্গে সঙ্গে সাদাত সেলিম সাহেবকে টেলিফোন করলাম। উনি একজন পক্ষীবিশারদ। বর্তমানে ঢাকা ক্লাবের প্রেসিডেন্ট। টেলিফোনে সহজে তাঁকে পাওয়া যায় না। আমার ভাগ্য ভালো, সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে গেলাম। আমি বললাম_বিশাল নুহাশ পল্লীকে পক্ষীর অভয়াশ্রম বলা যায়। আমি কেন এখানে মৃত পাখি দেখি না?

সাদাত সেলিম যে জবাব দিলেন তা হ্যারল্ড রশীদের জবাবের চেয়েও অদ্ভুত। তিনি বললেন, পাখিদের একটা সিক্সথ সেন্স আছে। এরা কখন মারা যাবে তা বুঝতে পারে। বুঝতে পারামাত্র দলবল ছেড়ে গহীন অরণ্যের দিকে যাত্রা করে। লোকচক্ষুর অন্তরালে গহীন অরণ্যে তাদের মৃত্যু হয় বলেই আমরা লোকালয়ে মৃত পাখি দেখি না।

পক্ষী বিষয়ে সাদাত সেলিমের চেয়েও অনেক অদ্ভুত কথা একজন বলে গেছেন, তাঁর নাম বাবর। তিনি মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। বাবর তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ' বাবরনামা' য় লিখেছেন, তাঁর সংগ্রহে একটি তোতা পাখি ছিল। তোতা পাখি কথা বলত, যা শুনত তা- ই বলত। তবে এই পাখির রক্ষক একদিন সম্রাটকে বলল, পাখিটা যে সব কথা শুনে শুনে বলে তা নয়, সে নিজ থেকেও কথা বলতে পারে। একদিন পাখিটা বলল, আমার নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। ঢাকনাটা খুলে দাও। আরেক দিনের কথা, সম্রাট দলবল নিয়ে যুদ্ধযাত্রা করেছেন। সঙ্গে তোতা পাখিও আছে। পথে এক জায়গায় তোতা পাখির রক্ষক ক্লান্ত হয়ে অপেক্ষা করছে। সবাই চলে গেছে। তখন পাখিটা বলল, সবাই চলে গেছে, আমরা বসে আছি কেন? আমরা কেন যাচ্ছি না?

সম্রাট বাবর তাঁর জীবনীতে গালগল্প ফাঁদবেন বলে মনে হয় না। তিনি সেই সময়কার হিন্দুস্তানের নিখুঁত বর্ণনা তাঁর গ্রন্থে

www.BDeBooks.Com

দিয়ে গেছেন। পাখির যে রক্ষক সম্রাটকে এই কথা বলেছে তার নাম আবুল কাসিম জালায়ের। সম্রাট লিখেছেন_এ আমর অত্যন্ত বিশ্বস্ত।
নানান ধরনের পাখি সম্পর্কে বাবর লিখে গেছেন। তার কয়েকটা উদাহরণ_

লুজা
মাথা থেকে লেজ পর্যন্ত এর গায়ে কয়েক রকমের রং। গলায় কবুতরের গলার মতো চকচকে রং আছে। এ পাখি পর্বতের চূড়ায় বাস করে।

ফিং
বিশাল পাখি। এদের এক একটি ডানা লম্বায় মানুষ সমান। এর মাথা ও গলায় কোনো লোম নেই। এর গলায় থলের মতো একটা কিছু ঝোলে। এর পিঠ কালো, বুক সাদা। এ পাখি মাঝেমধ্যেই কাবুলে দেখা যায়। একবার আমাকে একটা ফিং পাখি ধরে এনে দিল। পাখিটা পোষ মানল।

কোকিল
দৈর্ঘ্যে কাকের সমান, কিন্তু দেহ কাকের চেয়ে সরু। গান গায়। হিন্দুস্তানের বুলবুল। আমরা যেমন বুলবুল ভালোবাসি হিন্দুস্তানের লোকেরা তেমনি কোকিল ভালোবাসে। ঘন গাছের বাগানে থাকে।
অদ্ভুত আরেক পাখির কথা আমি দাদাজানের কাছে শুনেছি। তিনি এই পাখির নাম বলেছেন ' মউত পাখি' । যখন কোনো বাড়িতে কারো মৃত্যু ঘনিয়ে আসে তখন এই পাখি নাকি নিশিরাতে বাড়ির চালে এসে বসে অদ্ভুত গলায় ডাকতে থাকে। আমার সবচেয়ে ছোট ফুফুর মৃত্যুর দুই রাত আগে নাকি এমন একটা পাখি দাদাজানের বাড়ির টিনের চালে এসে বসে ডাকতে শুরু করে। আমার এই ফুফুর নাম মাহমুদা। মাত্র ১৩ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। আমার মা সব সময় বলেন, এমন রূপবতী কিশোরী তিনি তাঁর জীবনে দেখেননি।
পক্ষীবিশারদ সাদাত সেলিমের মতে, পাখি নিজের মৃত্যুর অগ্রিম খবর পায়। এই ক্ষেত্রে অন্য প্রাণীদের মৃত্যুর খবরও তাদের কাছে থাকার কথা।
পক্ষী প্রসঙ্গে এখানেই ইতি। এখন চলে যাই অন্য প্রসঙ্গে। অমাবস্যার রাত। আকাশভর্তি তারা। হ্যারল্ড রশীদ তাঁর টেলিস্কোপ তারাদের দিকে তাক করেছেন।
আমরা প্রথম দেখলাম লুব্ধক নক্ষত্র। আকাশের উজ্জ্বলতম তারা। ইংরেজি নাম সিরিয়াস। অতি প্রাচীন এক সভ্যতার নাম মায়া সভ্যতা। মায়ারা বলত তারা এসেছে লুব্ধক নক্ষত্রের পাশের একটি নক্ষত্র থেকে। লুব্ধক নক্ষত্রের পাশে কোনো নক্ষত্র এত দিন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। এখন জ্যোতির্বিদরা একটি নক্ষত্র আবিষ্কার করেছেন।
লুব্ধকের পরে আমরা দেখলাম একটা সুপার নোভা। তারপর দেখা হলো সপ্ত ভগিনী তারা গুচ্ছ (ঝবাবহ ংরংঃবৎং)। বৃহস্পতি ডুবে গিয়েছিল বলে বৃহস্পতি বা তার চাঁদ দেখা গেল না। শনিগ্রহের অবস্থান বের করতে হয় বৃহস্পতি গ্রহ থেকে। যেহেতু বৃহস্পতি নেই আমরা শনি দেখতে পারলাম না, তবে ঘড়ৎঃয ংঃধৎ খুব খুঁটিয়ে দেখলাম।
নর্থ স্টারের বাংলা নাম ধ্রুব তারা। রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত গান আছে_' তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুব তারা।' সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে পশ্চিমে অস্ত যায়। আকাশের সব তারা পশ্চিম দিকে ওঠে পূর্ব দিকে অস্ত যায়। একমাত্র ব্যতিক্রম নর্থ স্টার বা ধ্রুব তারা। এই তারা আকাশে স্থির হয়ে থাকে। নাবিকরা এই তারা দেখে দিক ঠিক করেন। আমাদের দেশের নৌকার মাঝিরাও এই তারা খুব ভালো করে চেনে।
তারা দেখা চলছে, হঠাৎ আমাদের আসরে চকচকে কালো রঙের এক কুকুর উপস্থিত হলো। হ্যারল্ড রশীদ বললেন, হুমায়ূন ভাই, এই কুকুরটা জ্বিন।
আমি বললাম, আপনার সমস্যা কী বলুন তো। সকালে বলেছেন মরা পাখি সব জ্বিন খেয়ে ফেলে। এখন বলছেন,

www.BDeBooks.Com

কালো কুকুর জ্বিন।
হ্যারল্ড রশীদ বললেন, আমি বই পড়ে বলছি।
_কী বই?
বইয়ের নাম ' জ্বিন জাতির অদ্ভুত ইতিহাস' ।
কে লিখেছেন? প্রকাশক কে?
এসব মনে নেই।
বইটা কি আছে আপনার কাছে?
না।
আমি ঢাকায় ফিরে এসেই নুহাশ চলচ্চিত্রের এক কর্মকর্তাকে বাংলাবাজারে পাঠালাম, সে যেভাবেই হোক ' জ্বিন জাতির অদ্ভুত ইতিহাস' গ্রন্থ জোগাড় করবে।
দুপুরবেলা সে জানাল, পাঁচটা ইতিহাস সে পেয়েছে। সব কিনবে কি না।
আমি বললাম, সব কিনবে।
সে বিকেলে পাঁচটা বই নিয়ে উপস্থিত হলো। আমি দেখলাম প্রতিটি বই হলো চীন জাতির ইতিহাস। সে চীনের ইতিহাসের সব বই কিনে নিয়ে চলে এসেছে।
যাই হোক, শেষ পর্যন্ত ' জ্বীন জাতির বিস্ময়কর ইতিহাস' বইটি পাওয়া গেছে। মূল বই আরবি ভাষায়। লেখক আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়তী (রহ.), অনুবাদ করেছেন মোহাম্মদ হাদীউজ্জামান। আরেকটি বই পাওয়া গেছে ' জ্বিন ও শয়তানের ইতিকথা' । এটিও আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়তী (রহ.)- এর লেখা। বই দুইটি পড়ে জ্বিন জাতি সম্পর্কে যা জেনেছি তার সারমর্ম_

জ্বীন শব্দের অর্থ
গুপ্ত, অদৃশ্য, লুকানো, আবৃত।

জ্বীন জাতির শ্রেণী বিভাগ
ক. সাধারণ জ্বীন।
খ. আমির : মানুষের সঙ্গে থাকে।
গ. আরওয়াহ : মানুষের সামনে আসে।
ঘ. শয়তান।
ঙ. ইফরীব্ব (শয়তানের চেয়েও বিপজ্জনক। এদের দেখা পেলে আযান দিতে হবে)।

জ্বীন কিসের তৈরি?
পবিত্র কোরান শরীফে বলা হয়েছে, " আমি আদমের আগে, জ্বীনকে সৃষ্টি করেছি ' লু' - র আগুন দিয়ে।" (সুরাহ আল হিজর, আয়াত ২৭)
হজরত ইবনে আব্বাস (র.) এই আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন ' লু' - র আগুনের অর্থ খুবই সুন্দর আগুন। হজরত উমার বিন দীনার (র.) বলেছেন, জ্বীন জাতি সৃষ্টি করা হয়েছে সূর্যের আগুন থেকে।

জ্বীনদের প্রকারভেদ
তিন শ্রেণীর জ্বীন আছে।
১. এরা হাওয়ায় উড়ে বেড়ায়। খাদ্য গ্রহণ করে না, নিজেদের মধ্যে বিয়ে হয় না। সন্তান উৎপাদন করে না।

www.BDeBooks.Com

২. এরা মানুষের সংস্পর্শে আসে, খাদ্য গ্রহণ করে। বিয়ে করে। সন্তান উৎপাদন করে।
৩. সাদা রঙের সাপ এবং সম্পূর্ণ কালো কুকুরও জ্বীন।

জ্বীনদের খাদ্য
নবীজি (স.) বলেছেন, তোমাদের খাদ্য এমন সব হাড় যার প্রতি আল্লাহর নাম নেওয়া হয়েছে, তাই জ্বীনের খাদ্য। (তিরমিযী)
(আমরা শুনি জ্বীনরা মিষ্টি খেতে পছন্দ করে। তার কোনো উল্লেখ পাইনি।)

জ্বীনদের সঙ্গে মানুষের বিয়ে
এই নিয়ে আলেমদের মতভেদ আছে। একদল বলেছেন জ্বীন যেহেতু সম্পূর্ণ অন্য প্রজাতির কাজেই তাদের সঙ্গে মানুষের বিয়ে অবৈধ।
আলেমদের আরেক দল বলছেন, পবিত্র কোরান শরীফে আল্লাহ শয়তানকে বলেছেন, ' তুই মানুষের সম্পদে ও সন্তানে শীরক হয়ে যা।' (সুরা বনি ইসরাইল, আয়াত ৬৪)
সন্তানে শারীক হতে হলে বিবাহ বাঞ্ছনীয়। কাজেই জ্বীনের সঙ্গে মানুষের বিয়ে হতে পারে।
মানুষ এবং জ্বীনের যৌনক্রিয়ায় যেসব সন্তান জন্মায় তারাই হিজড়া। { হজরত ইবনে আব্বাস (রা.)} এদের আরবি নাম খুন্নাস।

পাদটীকা
নিউজিল্যান্ডের এক বাড়িতে দুইটা ভূত ধরে বোতলবন্দি করা হয়েছে। একটি অল্প বয়সী দুষ্টু ভূত। অন্যটি শান্ত- ভদ্র ভূত। দুইটি ভূতই ইন্টারনেটের মাধ্যমে নিলামে তুলে বিক্রি করা হয়েছে।
সূত্র : কালের কণ্ঠ, ইন্টারনেট

৮

বন্দুক- মানব

গানম্যানের বাংলা করলাম ' বন্দুক- মানব' । ঘন বাংলা হয়নি, পাতলা বাংলা হয়েছে। ' গানম্যানে' যে কঠিন ভাব আছে, ' বন্দুক- মানবে' তা নেই। এখানে মানব শব্দটাই প্রাধান্য পেয়েছে। বন্দুক হয়েছে গৌণ। বাংলা ভাষার এ এক মজার খেলা।
অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি যেমন, মন্ত্রী- মিনিস্টার, দেশের প্রধান, রাজনৈতিক নেতাদের সরকার গানম্যান দেয়।
গানম্যানরা শাদা পোশাকে থাকে। তাদের পকেটে থাকে আধুনিক মারণাস্ত্র।
বিজ্ঞাপনে দেখি লাইফবয় সাবান জীবাণু থেকে সুরক্ষা দেয়। গানম্যানরাও গুরুত্বপূর্ণ মানুষদের সুরক্ষা দেয়।

www.BDeBooks.Com

এক সকালের কথা। থাকি ' দখিন হাওয়া' র ফ্ল্যাটে। সম্পূর্ণ একা। একজন বাবুর্চি ছিল, সে রাত একটা- দুটায় আমি ডিনার খাই দেখে কাউকে কিছু না বলে (এবং তার পাওনা বেতন না নিয়ে) চলে গেছে। আমি হাতমুখ ধুয়ে এক কাপ চা বানিয়ে পত্রিকা নিয়ে বসেছি, তখন ঘরে সুশ্রী চেহারার এক যুবক ঢুকল। তার গায়ের শার্ট দামি, প্যান্ট দামি, জুতো জোড়াও চকচক করছে। তার গা থেকে সেন্টের গন্ধ আসছে। আমি বললাম_কী ব্যাপার?

যুবক বলল, স্যার, আমি গানম্যান।

গানম্যান খুব ভালো কথা। আমার কাছে কী?

স্যার, আমি আপনার গানম্যান।

পানি খেতে গিয়ে লোকে বিষম খায়, আমি চায়ে চুমুক দিয়ে বিষম খেলাম। চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে বললাম, কোথাও কোনো ভুল হয়েছে। আমার কোনো গানম্যান নেই। থাকার কথাও না।

কোনো ভুল হয় নাই স্যার। এই যে আমার পরিচয়পত্র। পুলিশ হেডকোয়ার্টার থেকে আপনাকে একটা চিঠিও দেওয়া হয়েছে। এই যে চিঠি।

চিঠি পড়ে দেখি ঘটনা সত্যি। সরকার আমার জন্য গানম্যানের ব্যবস্থা করেছে। গানম্যান সার্বক্ষণিকভাবে আমার সঙ্গে থাকবে। আমাকে সুরক্ষা দেবে। আমি বললাম_হলি কাউ!

গানম্যান বলল, কী বললেন বুঝতে পারলাম না।

আমি বললাম, বুঝতে হবে না। ঘরে সিগারেট নেই বলে সিগারেট খেতে পারছি না। তুমি এক প্যাকেট সিগারেট কিনে আনতে পারবে?

অবশ্যই পারব স্যার।

গানম্যান সিগারেট কিনতে গেল, আমি পরিস্থিতি নিয়ে ভাবতে বসলাম। গানম্যান নিয়ে ঘোরার মধ্যে আতদশ্লাঘার বিষয় আছে। নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ ভাবা এবং অন্যের কাছে গুরুত্বপূর্ণ করা। এই পরিস্থিতিতে আমি কী করব বুঝতে পারছি না। গানম্যানের আনা সিগারেট টেনেও মাথা পরিষ্কার হলো না। আমি পুলিশ হেডকোয়ার্টারের সঙ্গে যোগাযোগ করে বিনয়ের সঙ্গে বললাম, আমি একজন লেখক মানুষ। লেখক ঘুরবে ঝোলা নিয়ে, ঝোলায় থাকবে কাগজ- কলম। লেখক কখনো গানম্যান নিয়ে ঘুরবে না। আপনি গানম্যান উঠিয়ে নিন।

কয়েক দিন থাকুক। তারপর আপনার কথামতো উঠিয়ে নেব।

কয়েক দিন শুনে রাজি হলাম, সেই কয়েক দিন তিন বছর পর্যন্ত গড়াল। যা- ই হোক, প্রথম দিনের কথা বলি। দুপুর তিনটার দিকে গানম্যান বলল, স্যার, দুপুরে খাওয়ার ব্যবস্থা কী?

খাওয়ার কোনো ব্যবস্থা নাই। পাশের ফ্ল্যাট থেকে খাবার আসে। আজ মনে হয় ভুলে গেছে। মাঝেমধ্যে তারা খাবার পাঠাতে ভুলে যায়।

আমরা দুপুরে খাব না?

তেহারির দোকান থেকে দুই প্যাকেট তেহারি নিয়ে আসো।

আপনার কি গাড়ি আছে?

গাড়ি আছে। ড্রাইভার নাই। রিকশা করে চলে যাও।

গানম্যান চিন্তিত ভঙ্গিতে তেহারি আনতে বের হলো।

সন্ধ্যার কথা। বন্ধুবান্ধব আসবে। ওল্ড ফুলস ক্লাবে আড্ডা বসবে। আমার বসার ঘরের দরজা সব সময় খোলা থাকে। হিমু তার ঘরের দরজা খোলা রাখে, আমি হিমুর বাবা। আমারও ঘরের দরজা খোলা রাখা উচিত।

আজ দরজা বন্ধ। দরজার পাশে চেয়ার নিয়ে গানম্যান বসে আছে। তার চোখমুখ কঠিন।

দরজার বেল বাজল। গানম্যান দরজা খুলে বলল, হাত উপরে তুলুন, বডি চেক। ভয় পাবেন না। রুটিন চেক। হুমায়ূন স্যারের সিকিউরিটির বিষয়।

আমার কাছে এসেছে ছেলেবেলার বন্ধু ডাক্তার করিম (অ্যাটমিক এনার্জি কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান)। সে হাত তুলল।

www.BDeBooks.Com

বডি চেক করা হলো। গানম্যান বলল, আপনার ব্যাগে কী? ব্যাগ খুলুন, ব্যাগে কী আছে দেখব।
করিম ভয়ে ভয়ে বলল, আপনি কে?
আমি হুমায়ূন স্যারের গানম্যান। এখন বলুন, আপনি কে, কোত্থেকে এসেছেন, কেন এসেছেন?
করিম বলল, আমি পাঁচতলায় এসেছিলাম আলমগীর রহমানের কাছে। ভুলে ছয়তলায় চলে এসেছি। হুমায়ূন আহমেদকে আমি সেভাবে চিনি না।
একটা চৈনিক প্রবাদ আছে_' হাঁচি, কাশি এবং প্রেম কারো কাছ থেকে লুকানো যায় না।' আমি এই তিনটির সঙ্গে আরেকটি যুক্ত করেছি_' হাঁচি, কাশি, প্রেম এবং গানম্যান কারো কাছ থেকে লুকানো যায় না।' কিছুদিনের মধ্যে সবাই জেনে গেল আমার সঙ্গে একজন দুর্ধর্ষ গানম্যান আছে। বন্ধুবান্ধবদের বাসায় আসা আশঙ্কাজনকভাবে কমে গেল। দশ দিনের মাথায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এল। আমি গানম্যানকে বললাম, আমার দরজা সব সময় খোলা থাকবে, কাউকে চেক করা যাবে না। অতিথিদের নাম- ঠিকানা লেখা যাবে না। আমি যখন বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দেব তখন সামনে দিয়ে হাঁটাহাঁটি করা যাবে না।
গানম্যান নতুন রুটিনে দ্রুত অভ্যস্ত হয়ে গেল। সে আমার পাশে একটা ঘরে ঘুমায়, সকালে ঘুম থেকে উঠে নাশতা খেয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুম থেকে উঠে গোসল সেরে দুপুরের খাবার খেয়ে আবার ঘুম। ঘুম ভাঙার পর সে আমার লেখা গল্প- উপন্যাসের বই হাতে নিয়ে চোখমুখ শক্ত করে পড়ে। যেন পরীক্ষার পড়া মুখস্থ করছে। সাহিত্য নিয়ে মাঝেমধ্যে কিছু আলোচনাও হয়। যেমন_' স্যারের এই বইটা তেমন ভালো হয় নাই। এন্ডিংয়ে ঝামেলা আছে।'
আমাদের দুজনের জীবনচর্যায় মিল পাওয়া গেল। সে তার ঘরে একা থাকে, আমিও আমার ঘরে একা থাকি। সে সারা দিন ঘুমায়, আমি সারা দিন লিখি। সন্ধ্যার পর থেকে সে বই পড়ে, আমিও বই পড়ি। গভীর রাত পর্যন্ত সে হিন্দি সিরিয়াল দেখে। গভীর রাত পর্যন্ত আমিও ভিসিআরে সিনেমা দেখি।
গানম্যানের নিঃসঙ্গতা কাটল, আমার একজন বাবুর্চি জোগাড় হলো। গানম্যান বাজার করে আনে, দুজনে মিলে কোটাবাছা করে। রান্না চাপায়। একদিন মজার এক দৃশ্য দেখলাম, রান্নাঘরে গানম্যান লেপটা দিয়ে বসে কচুর লতি বাছছে। পাশেই লোডেড পিস্তল।
কোরবানির ঈদে সে ছুটি নিয়ে দেশে গেল না। আমাকে একা ফেলে যাবে না। ঈদের দিন আমাকে কে দেখবে? আমি কোরবানি দেব না শুনে সে মুষড়ে পড়ল। আমি বললাম, মাংস কাটা, রান্না করা, এসব কে করবে? ঘরে কেউ নাই। বাবুর্চি ছুটি নিয়ে চলে গেছে।
স্যার, আমি তো আছি। টাকা দিন, খাসি কিনে নিয়ে আসি। আরেকটা কথা, আপনার অনুমতি ছাড়াই পাশের বাসার মাজহার স্যারের গরুতে একটা নাম দিয়ে দিয়েছি।
তাকে নিয়ে ঈদের নামাজ পড়তে গিয়ে আরেক যন্ত্রণা। সিজদায় গিয়েছি, টুপ করে শব্দ হলো। তাকিয়ে দেখি পকেট থেকে গানম্যানের পিস্তল জায়নামাজে পড়ে গেছে। মুসল্লিরা তাকিয়ে আছেন আতঙ্কিত চোখে।
গানম্যানদের প্রতিমাসেই গাজীপুরে পিস্তল শুটিংয়ের পরীক্ষা হয়। একবার পরীক্ষা দিয়ে আমার গানম্যান খুব মন খারাপ করে ফিরল।
আমি বললাম, কী হয়েছে?
সে বলল, পরীক্ষা খারাপ হয়েছে। হাতের টিপ নষ্ট হয়ে গেছে।
কচুর লতি বাছলে হাতের টিপ তো নষ্ট হবেই।
তার পরও স্যার অসুবিধা নাই। আপনার ওপর কোনো হামলা হলে পঁচিশ গজের ভেতর যে আসবে তারেই শুট করে ফেলে দেব। একটা হামলা হোক, দেখেন স্যার কী করি?
গানম্যান হামলার আশায় দিন কাটাতে লাগল। সন্ত্রাসী হামলা হলো না, তবে অন্য ধরনের হামলায় জীবনসংশয় হলো। এই হামলার নাম হার্ট অ্যাটাক। ল্যাবএইড হাসপাতালে ভর্তি হলাম। আমাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে, গানম্যান সঙ্গে যাবে। ডাক্তার বললেন, অসম্ভব! আপনি যেতে পারবেন না।

www.BDeBooks.Com

গানম্যান বলল, অবশ্যই আমাকে যেতে হবে। ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে যদি স্যারের ওপর হামলা হয় কে সামলাবে? আপনারা সামলাবেন? জবাবদিহি তো আপনাদের করতে হবে না। আমাকে করতে হবে।
আমাকে সিডেটিভ দেওয়া হয়েছিল। গানম্যান এবং ডাক্তারদের তর্কবিতর্ক শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম ভাঙল অনেক রাতে। চোখ মেলে দেখি, আমি পর্দাঘেরা ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে আছি। আমার পাশে গানম্যান দাঁড়িয়ে। তার চোখ মমতায় আর্দ্র। সে বলল, স্যার আমি আছি। কোনো রকম দুশ্চিন্তা করবেন না। কেউ এসে হামলা করুক দেখেন কী করি?
তার মমতাভেজা কণ্ঠ বলে দিল সে গানম্যান না, বন্দুক- মানব।
পাদটীকা
জমিকে লালাউ গুল জিনহে খেয়াল নেহি
ও লোগ চান্দসিতারোঁ কি বাৎ করতে হ্যায়।
খয়াল কানপুরী

পৃথিবীর বুকের ফুলফল লতাগুল্মে যার চোখ নেই, সে- ই শুধু আকাশের চন্দ্র এবং নক্ষত্রের গল্প করে।

৯
ডায়েরি

পৃথিবীখ্যাত জাপানি পরিচালক কুরাশুয়াকে জিজ্ঞেস করা হলো, একজন বড় পরিচালক হতে হলে কী লাগে?
কুরাশুয়া জবাব দিলেন, একজন ভালো অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর লাগে।
এডগার এলেন পোকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, একজন বড় লেখক হতে হলে কী লাগে?
তিনি জবাব দিলেন, একটা বড় ডাস্টবিন লাগে। লেখা নামক যেসব আবর্জনা তৈরি হবে, তা ফেলে দেওয়ার জন্যে। লেখকরা ক্রমাগতই আবর্জনা তৈরি করেন। নিজেরা তা বুঝতে পারেন না। একজীবনে আমি কী পরিমাণ আবর্জনা তৈরি করেছি, ভেবেই শঙ্কিত বোধ করছি। ' ফাউনটেনপেন' সিরিজের লেখাগুলি কি আবর্জনা না? যখন যা মনে আসছে লিখে যাচ্ছি। চিন্তা- ভাবনার প্রয়োজন বোধ করছি না। লেখকের চিন্তা- ভাবনাহীন লেখা পাঠক যখন পড়েন, তখন তারাও চিন্তা- ভাবনা করেন না। এই জাতীয় লেখার ভালো আশ্রয় ডাস্টবিন; পত্রিকার পাতা না। ঠিক করেছি, কিছুদিন ফাউনটেনপেন বন্ধ থাকবে। ইমদাদুল হক মিলনকে বলব, ফাউনটেনপেনের কালি শেষ হয়ে গেছে।
কলমের কালি প্রসঙ্গে মনে পড়ল ছোটবেলায় ফাউনটেনপেনের কালি আমরা নিজেরা বানাতাম। কালির ট্যাবলেট পাওয়া যেত, এক আনা করে দাম। দোয়াতভর্তি পানি নিয়ে একটা ট্যাবলেট ফেলে দিলেই কালি। বিত্তবানদের ছেলেমেয়েরা এক দোয়াত পানিতে দুটা ট্যাবলেট ফেলে কালি ঘন করত। কালো কালিতে কোনো এক অদ্ভুত আলো প্রতিফলনের সোনালি আভা বের হতো।
শৈশবে পড়াশোনা একেবারেই পছন্দ করতাম না। কিন্তু কালি আগ্রহের সঙ্গে বানাতাম। এই কালি ফাউনটেনপেনে ভরা হতো না। নিবের কলম দিয়ে লেখা হতো। অনেকের মতো আমারও একটা অদ্ভুত দোয়াত ছিল। এই দোয়াত উল্টে গেলেও

www.BDeBooks.Com

কালি পড়ত না। এই দোয়াতটাকে মনে হতো বিজ্ঞানের বিস্ময়কর অবদান। দোয়াত উল্টে গেছে, কালি পড়ছে না_ঘটনা কীভাবে ঘটছে, ভেবে শৈশবে অনেকবার মাথা গরম করেছি।

এখন কালি প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্প। একবার ' সুলেখা' নামের কালির বিজ্ঞাপন লিখে দেওয়ার জন্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে হাত পাতা হলো।

কবি লিখলেন,

' সুলেখা কালি।

এই কালি কলঙ্কের চেয়েও কালো।'

অদ্ভুত সুন্দর বিজ্ঞাপন না?

পাঠক, বুঝতে পারছেন, আমি কীভাবে যা মনে আসছে লিখে যাচ্ছি? এ ধরনের লেখা আমি ব্যক্তিগত ডায়েরিতে কিছুদিন লিখতাম। ব্যক্তিগত ডায়েরি শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিগত থাকেনি। দৈনিক বাংলায় ধারাবাহিকভাবে ' আপনারে আমি খুঁজিয়া বেড়াই' শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে।

ব্যক্তিগত ডায়েরির ব্যাপারটা আমি বুঝি না। এগুলি কেন লেখা হয়? যিনি লিখছেন, তার পড়ার জন্যে? লেখক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হলে ঠিক আছে। তার ডায়েরি প্রকাশিত হলে সেই সময়ের রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ বোঝা যাবে। জনাব তাজউদ্দীন আহমদের অপ্রকাশিত ডায়েরি আমি সাপ্তাহিক পত্রিকায় নিয়মিত পড়ি। ২৩.১১.৫২ ও ২৪.১১.৫২ তারিখে তাঁর ডায়েরিতে কী লেখা?

২৩.১১.৫২

সকাল ৬টায় উঠেছি।

সকাল ৯টা থেকে রাত সোয়া ৯টা পর্যন্ত দোকানে।

বিছানায় গেলাম রাত সাড়ে ১০টায়।

আবহাওয়া : আগের মতোই।

২৪.১১.৫২

ভোর ৫টায় উঠেছি।

দোকানে কাটালাম সকাল সাড়ে ৯টা থেকে বেলা ১টা

এবং বেলা আড়াইটা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত।

সাত্তার খান কয়েক দিন আগে আমার কাছ থেকে টিআর ফরম নিয়েছিলেন, যা তিনি তার কাছে রেখেছিলেন। তিনি এলেন সকাল দশটার দিকে।

বিছানায় গেলাম রাত সাড়ে দশটায়।

আবহাওয়া : আগের মতোই।

২৭ তারিখে আবহাওয়া আগের মতোই ছিল না। তিনি লিখেছেন_

আবহাওয়া : আগের মতোই, তবে ঠাণ্ডা একটু বেশি।

পাঠক হিসেবে ডায়েরি পড়ে আমি জানলাম, জনাব তাজউদ্দীন খুব ভোরবেলা ঘুম থেকে ওঠেন। রাত দশটায় ঘুমুতে যান। আবহাওয়া থাকে আগের মতোই। তাঁর মতো অতি গুরুত্বপূর্ণ একজন মানুষ কেন দিনের পর দিন গুরুত্বহীন বিষয় লিখে গেছেন, কে জানে! তাঁর ডায়েরির গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলিই পাঠকের কাছে আসা উচিত।

সুররিয়েলিস্টিক পেইন্টিংয়ের গ্র্যান্ডমাস্টার সালভাদর দালিও ডায়েরি রাখতেন। তবে সব দিনের না। যেদিন গুরুত্বপূর্ণ কিছু ঘটত কিংবা নতুন কিছু ভাবতেন, সেদিনই ডায়েরি লিখতেন। আমার কাছে যে কপি আছে, সেটি ১৯৫২ থেকে ১৯৬২ পর্যন্ত। কাকতালীয়ভাবে একই সময়ে বাংলাদেশে (তখন পূর্ব পাকিস্তান) জনাব তাজউদ্দীনও ডায়েরি লিখেছেন। ১৯৫৩ সালের সেপ্টেম্বরের ১৩ তারিখ তিনি লিখেছেন_

সারা জীবন ছবি এঁকে গেলে আমি সুখী হতাম না। এখন আমার কাছে মনে হচ্ছে, মানসিক পূর্ণতা আমার হয়েছে। .....

www.BDeBooks.Com

প্রথমবার রোমে এসে যে ভঙ্গিতে বলেছেন_অবশেষে আমার জন্ম হচ্ছে। আমারও সেই অবস্থা।
এডগার এলেন পো মাঝেমধ্যে ডায়েরি লিখতেন। তাঁর ডায়েরির ভাষা ছিল দুর্বোধ্য। মাঝে মাঝে সাংকেতিক ভাষাও ব্যবহার করতেন। তাঁর সাংকেতিক লেখার পাঠোদ্ধার হয়নি।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কি ডায়েরি লিখতেন? তাঁর লেখা ' রাশিয়ার চিঠি' কে এক ধরনের ডায়েরি বলা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন অত্যন্ত গোছানো মানুষ। কাউকে চিঠি লিখলে তার কপি রাখতেন। এসব চিঠিই ডায়েরির কাজ করত।
সতীনাথ ভাদুড়ির ডায়েরি আমার কাছে বিস্ময়কর মনে হয়েছে। তিনি দিনলিপির পাশাপাশি গল্পের খসড়া লিখে গেছেন। গল্পের খসড়া এবং মূল গল্প পাশাপাশি পড়তে অদ্ভুত লাগে।
সতীনাথ ভাদুড়ির অনুকরণে কিছুদিন আমি ডায়েরিতে গল্পের খসড়া লেখার চেষ্টা করেছি এবং একদিন সকালে ' দূর ছাই' বলে ডায়েরি যথাস্থানে অর্থাৎ ডাস্টবিনে ফেলে দিয়েছি।
ডায়েরি না লিখলেও আমি নানান তথ্য কিন্তু লিখে রাখি। অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ একদিন বললেন, মুমূর্ষু বলতে আমরা মৃত্যুপথযাত্রী বুঝাই। অভিধান তা বলে না। অভিধানের অর্থ হচ্ছে_মরিবার ইচ্ছা। যার মরতে ইচ্ছা করে, সে- ই ' মুমূর্ষু' । আমার তথ্যখাতায় এটা লেখা। লেখার নমুনা_
১০ এপ্রিল ২০১০
জাদুকর জুয়েল আইচের জন্মদিনে অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ মুমূর্ষু শব্দের আভিধানিক অর্থ জানালেন।
উনি বললেন, মুমূর্ষু শব্দের মানে আমরা জানি মরণাপন্ন। আসলে তা না। অভিধান বলছে_মুমূর্ষু হলো মরিবার ইচ্ছা।
আমি জানি, উনি ভুল করছেন। মুমূর্ষু অবশ্যই মরণাপন্ন। মুমূর্ষা হলো মরিবার ইচ্ছা। এই ভুল তথ্য আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের বক্তৃতার মাধ্যমে দেওয়া ঠিক না। গুরুত্বহীন মানুষের ভুলে তেমন কিছু যায়- আসে না। গুরুত্বপূর্ণ মানুষের ভুলে যায়- আসে।
পাদটীকা
পটল সামান্য একটা সবজি। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এই সবজির দু' টা ব্যবহার আছে।
' পটলচেরা চোখ'
পটলকে লম্বালম্বিভাবে ফালা করলে টানা টানা চোখের মতো লাগে। সেই থেকে পটলচেরা চোখ।
' পটল তোলা'
পটল তোলা হলো মৃত্যু। তুচ্ছার্থে এর ব্যবহার। যেমন, হাবলু পটল তুলেছে।
পটল তোলার সঙ্গে মৃত্যুর কী সম্পর্ক, আমি অনেকদিন জানতাম না। বাংলা ভাষার পণ্ডিতদের জিজ্ঞেস করেছি, তারাও কিছু জানাতে পারেননি।
সম্প্রতি আমি এই বাগধারার উৎস জেনেছি। পাঠকদেরও জানাচ্ছি_' লিখে রাখো এক ফোঁটা দিলেম শিশির।'
ফলবান পটলগাছের সবগুলি পটল তুলে নিলে গাছটি মারা যায় বলেই পটল তোলা মৃত্যু বুঝায়। [তথ্যের উৎস : সরল বাঙ্গালা অভিধান, সুবল চন্দ্র মিত্র সংকলিত, নিউ বেঙ্গল প্রেস।]

কুইজ
পাদটীকার সঙ্গে এখন থেকে কুইজ যুক্ত হচ্ছে। আজকের কুইজ_
কোন প্রাণীর হৃৎপিণ্ড থাকে তার মাথায়?
উত্তর : পিপীলিকা।

www.BDeBooks.Com

১০.

' বৃষ্টি নেশা ভরা সন্ধ্যাবেলা'

রবীন্দ্রনাথের লেখা এই লাইনটি আমার অতি অতি প্রিয়। কবি ধরতে পেরেছেন বৃষ্টি প্রকৃতিতেও নেশা ধরিয়ে দেয়। মানুষ কোন ছাড়।

বৃষ্টি আমাকে নেশাগ্রস্ত করে। ভালোভাবেই করে। ব্যাপারটা শুরু হয়েছে আমার শৈশবে। তখন সিলেটে থাকি। সিলেটের বিখ্যাত বৃষ্টি। একবার শুরু হলে সাত দিন আট দিন থাকে। ইচ্ছা করে ভিজে চুপচুপা হয়ে স্কুলে যাই। স্যার আমাকে দেখে আঁতকে উঠে বলেন, এ কী অবস্থা! নিউমোনিয়া বাঁধাবি তো। যা বাড়ি যা। ভেজা কাপড়ে স্কুল করতে হবে না। গাধা কোথাকার! বাসায় ফিরে বই- খাতা রেখে আবার বৃষ্টিতে নেমে যাওয়া। কাঁচা আমের সন্ধানে আমগাছের নিচে নিচে ঘুরে বোড়ানো। তখনকার অভিভাবকরা সন্তানদের নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। সন্তানরা তাদের কাছে হাঁস- মুরগির মতো। সন্ধ্যা হলে হাঁস- মুরগির মতো তারা ঘরে ফিরলেই চলবে।

আমাদের সময় ' রেইনি ডে' বলে একটা ব্যাপার ছিল। জটিল বৃষ্টি হলে স্কুল ছুটি। হেডস্যার ভাব করতেন ছুটি দিতে গিয়ে তিনি মহাবিরক্ত। কিন্তু তাঁর মুখেও থাকত চাপা আনন্দ। বৃষ্টি তার আনন্দ সবার মধ্যেই ছড়িয়ে দেয়।

আজকালকার ইংরেজি স্কুলের শহুরে ছেলেমেয়েরা এই আনন্দ থেকে বঞ্চিত। তারা গাড়ি করে স্কুলে আসে, গাড়ি করে চলে যায়। ঝড়- বৃষ্টি তাদের স্পর্শ করে না।

যে কথা বলছিলাম, বৃষ্টির ব্যাপারে আমি নেশাগ্রস্ত। বৃষ্টি হলে আমি জলধারায় নিজেকে সমর্পণ করব এটা নিপাতনে সিদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে। নুহাশ পল্লী এবং নুহাশ চলচ্চিত্রের স্টাফরা বিষয়টায় খুবই আনন্দ পায়। অতিথিদের সঙ্গে তাদের আলাপ- আলোচনা_

" বৃষ্টি নামছে আর স্যার ঘরে বসা, এই জিনিস হবে না। তখন স্যারের তালাবদ্ধ করে রাখেন স্যার তালা ভেঙে বের হয়ে যাবে। যতক্ষণ বৃষ্টি থাকবে ততক্ষণ স্যার বৃষ্টিতে ব্যাঙের মতো লাফালাফি করবে।"

সমস্যা হয়েছে ইদানীং বৃষ্টিতে নামতে ইচ্ছা করে না। নিশ্চয়ই ' বয়স ফ্যাক্টর' । তার পরও বাধ্য হয়ে নামি। না নামলে আমার স্টাফদের ইজ্জত থাকে না।

গত বর্ষায় আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামল। আমি আমার ঘরে বসে আছি। রিডার্স ডাইজেস্টের একটা পুরনো সংখ্যায় চোখ বুলাচ্ছি, দরজা খুলে নুহাশ পল্লীর ম্যানেজার বুলবুল ঢুকল। উত্তেজিত গলায় বলল, স্যার মনে হয় খেয়াল করেন নাই। বিরাট বৃষ্টি। ভিজবেন না?

আমি বই বন্ধ করতে করতে বললাম, আসছি।

পুকুরে নৌকা রেডি করেছি যদি নৌকায় বসে বৃষ্টি দেখতে চান।

পুকুরপাড়ের দিকে যাব, তোমরা দল বেঁধে পিছে পিছে আসবে না। আমি বৃষ্টিতে ভিজছি এটা হাঁ করে দেখার কিছু নাই। অবশ্যই নাই। আমরা দিঘির দিকে যাব না।

বৃষ্টিতে নেমেই যৌবনকালের মাহাতদ্য বুঝলাম। তখন বৃষ্টির আনন্দে অভিভূত হতাম এখন থরথর করে শীতে কাঁপছি। দাঁত কিড়মিড় করা শুরু করেছে। যাচ্ছি পুকুরপাড়ের দিকে। পরিকল্পনা হলো, শ্বেতপাথরের ঘাটে বসে বৃষ্টি দেখব। ঘাটে বসে আছি। ঘনঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। বিদ্যুৎ চমকানোর কিছুক্ষণ পর বজ্রপাতের শব্দ। ওই যে আলোর গতি এবং শব্দের গতির পার্থক্য, নাটক- সিনেমায় অবশ্যি বিদ্যুতের ঝলক এবং বজ্রপাতের শব্দ একসঙ্গে দেখানো হয়। বিদ্যুৎ চমকের পরপর বজ্রপাতের শব্দের জন্য অপেক্ষা করার অদ্ভুত টেনশনও উপভোগ করার মতো ব্যাপার। শব্দটা বড় হবে না, ছোট হবে। অল্পক্ষণ হবে, নাকি অনেকক্ষণ।

বজ্রপাতের অপেক্ষা করছি হঠাৎ আমার ভেতরের সিক্সথ সেন্স আমাকে সতর্ক করল। আমি সঙ্গে সঙ্গে ঘাটে লম্বা হয়ে শুয়ে

www.BDeBooks.Com

পড়লাম। আমার ছয় থেকে সাত হাত দূরে একটা সুপারিগাছের ওপর বজ্রপাত হলো। গাছ সঙ্গে সঙ্গে পুড়ে কয়লা। আমি প্রথম এত কাছে বজ্রপাত দেখলাম। বজ্রপাতের আলো দূর থেকে নীল দেখা যায়। খুব কাছ থেকে এই আলো কিন্তু গাঢ় কমলা।

বজ্রপাতে মৃত্যু না হওয়ায় একটি কারণে যথেষ্ট সন্তোষ লাভ করলাম_আমাকে আল্লাহ সরাসরি শাস্তি দিয়েছেন এটা এখন কেউ বলবে না। প্রচলিত ধারণা হচ্ছে, অতি দুষ্টদের আল্লাহপাক বজ্রপাতের মাধ্যমে সরাসরি শাস্তি দেন।

উদাহরণ সিরাজউদ্দৌলার হত্যাকারী মিরন। তার ঘটনা এ রকম_

সিরাজউদ্দৌলার আপন খালা ঘসেটি বেগম এবং সিরাজউদ্দৌলার মা আমেনা বেগম বজরায় করে বুড়িগঙ্গা নদী পার হচ্ছেন। ব্যবস্থা করে দিয়েছে মিরন। ঘসেটি বেগম হঠাৎ দেখলেন, মাঝনদীতে বজরা আসামাত্র নৌকার মাঝিমাল্লারা বজরা ফেলে ঝাঁপিয়ে বুড়িগঙ্গায় পড়ল এবং প্রাণপণে সাঁতরাতে লাগল তীরের দিকে। বজরার নিচ ফুটো করা হয়েছে। বজরা পানিতে ডুবতে শুরু করেছে। ঘসেটি বেগম মিরনের ষড়যন্ত্র বুঝতে পারলেন। তিনি বজরার ছাদে উঠে চিৎকার করে বললেন, মিরন! তুই মারা যাবি বজ্রাঘাতে।

ইতিহাস বলে, বজ্রপাতের কারণেই মিরনের মৃত্যু হয়েছে। আমার কথা হচ্ছে আল্লাহপাক কী সরাসরি শাস্তি দেন? যদি দিতেন তাহলে পৃথিবীর চেহারা অন্য রকম হতো। অতি দুষ্টলোকদের আমি কখনোই শাস্তি পেতে দেখিনি। তারা পরম সুখে জীবন পার করে। একপর্যায়ে মাদ্রাসা- মসজিদ বানায় বলে পরকালেও হয়তো তারা পরম সুখে বাস করবে।

আল্লাহপাক সম্বন্ধে আমাদের কিছু ভ্রান্ত ধারণা আছে। যেমন বলা হয়, নর- নারীর বিবাহের ব্যাপারটা তিনি দেখেন। ইরনষব- এ এই কথা আছে_গধৎৎরমবং ধৎব সধফব রহ যবধাবহ.

আমার এক বন্ধু চার- পাঁচটা বিয়ে করেছেন (সঠিক সংখ্যা রহস্যাবৃত) এবং ছেড়ে দিয়েছেন। কারণ কোনো স্ত্রী তাকে সুখ দিতে পারেনি। বর্তমানে সুখের জন্য তিনি স্ত্রীর বিকল্পের সন্ধানে ব্যস্ত। এখন তিনি যদি বলেন, বিয়ে- শাদি তো আল্লাহর হাতে। উনি যা ঠিক করেছেন আমার ক্ষেত্রে তাই হয়েছে_তাহলে কি চলবে?

ইসলামের দুটি ধারা। এক ধারা বলছে ঋৎবব রিষষ- এর কথা, অর্থাৎ মানুষকে বিবেচনা- শক্তি দিয়ে পাঠানো হয়েছে। আরেক দল ফ্রি উইল অস্বীকার করেন। তারা বলেন, সবই পূর্ব নির্ধারিত। এই ক্ষেত্রে তারা সুরা বনি ইসরাইলের একটি আয়াত উল্লেখ করেন_

' আমি তোমাদের ভাগ্য তোমাদের গলায় হারের মতো ঝুলাইয়া দিয়াছি। ইহা আমার পক্ষে সম্ভব।'

বলা হয়ে থাকে, পাঁচটা জিনিস আল্লাহপাক সরাসরি নিজের কনট্রোলে রেখেছেন। যেমন_

১. হায়াত

২. মৃত্যু

৩. ধন- দৌলত

৪. রিজিক

৫. বিবাহ

ধর্ম বিষয়ে আমার সীমিত পড়াশোনায় যা জানি তা হচ্ছে_

পাঁচটা বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহর হাতে।

১. কেয়ামত কখন হবে।

২. কোথায় কখন বৃষ্টি হবে।

৩. মায়ের গর্ভে কি আছে (ছেলে- মেয়ে তাদের ভাগ্য ইত্যাদি)।

৪. মানুষ আগামীকাল কি উপার্জন করবে।

৫. তার মৃত্যু কোথায় কিভাবে ঘটবে।

(সূত্র: সূরা লোকমান। আয়াত- ৩৪)

আমি কোনো ভুল করেছি এ রকম মনে হয় না তারপরও এই বিষয়ে জ্ঞানী আলেমদের বক্তব্য আমি আগ্রহের সঙ্গে শুনব।

www.BDeBooks.Com

পাদটীকা

আমার তিন বছর বয়েসী পুত্র নিষাদকে জিজ্ঞেস করলাম, বাবা! আল্লাহ কোথায় থাকেন?

সে যথেষ্ট জোর দিয়ে বলল, ' আকাশে থাকেন' । তার সঙ্গে আমাদের দেশের ক্রিকেট প্লেয়ারদের চিন্তাতেও মিল দেখলাম। ক্রিকেট প্লেয়াররা কোনোক্রমে একটা হাফ সেঞ্চুরি করলেই আকাশের দিকে তাকিয়ে তাদের কৃতজ্ঞতা নিবেদন করেন। তাঁরাও জানেন আল্লাহ আকাশে থাকেন।

শিশুপুত্র নিষাদ আল্লাহর অবস্থান বলেই ক্ষান্ত হলো না। সে বলল, আল্লাহর কাছে দুটি বড় এসি আসে। একটা এসি দিয়ে তিনি গরম বাতাস দেন, তখন আমাদের গরম লাগে। আরেকটা এসি তিনি ঠাণ্ডা বাতাস দেন তখন আমাদের ঠাণ্ডা লাগে।

কুইজ- ১

কোন মোগল সম্রাট টাঁকশাল থেকে স্বর্ণমুদ্রা ছেড়েছিলেন সেখানে লেখা_' আমি আল্লাহ' । কিন্তু সেই সময়কার মাওলানারা তার জোরালো প্রতিবাদ করতে পারেননি।

উত্তর : সম্রাট আকবর। তিনি স্বর্ণমুদ্রায় লিখলেন আল্লাহু আকবর। এর একটি অর্থ আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। অন্য অর্থ আকবর আল্লাহু। সম্রাট আকবর তখন নতুন ধর্মমত প্রচার শুরু করেছেন_' দিন- ই- এলাহি' । মোল্লারা যখন তাকে স্বর্ণমুদ্রায় লেখা নিয়ে প্রশ্ন করল তখন তিনি হাসতে হাসতে বললেন, যে অর্থ গ্রহণ করলে আপনারা খুশি হন সেই অর্থ গ্রহণ করুন। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ এই অর্থ নিন।

কুইজ- ২

প্রতি সেকেন্ডে পৃথিবী পৃষ্ঠে কতবার বজ্রপাত হয়?

উত্তর : দুইশত বার।

১১

ক্ষুদে গানরাজ

স্যার আপনি কি গান গাইতে জানেন?

না।

গান বোঝেন?

না।

রাগ বিষয়ে জ্ঞান আছে?

না।

মীড়, গমক, মূর্ছনা_এইসব কী?

জানি না কী।

তাহলে ক্ষুদে গানরাজের প্রথম বিচারক হলেন কী জন্যে?

www.BDeBooks.Com

এই প্রশ্নের একটাই উত্তর, ' ভুল হয়ে গেছে। মানুষ হিসেবে ভুল করার অধিকার আমার আছে।' মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন একবার শিশুদের কবিতা আবৃত্তির বিচারক হয়েছিলেন। ঔপন্যাসিক চার্লস ডিকেন্স কুস্তি প্রতিযোগিতার বিচারক হয়েছিলেন।

ক্ষুদে গানরাজের আরেকজন বিচারকের নাম মেহের আফরোজ শাওন। সে আমার পরিচিত। সে গান জানে, গান বোঝে, রাগ জানে, মীড়- গমক- মূর্ছনা জানে। এ রকম একজন বিচারক পাশে থাকলে নির্ভয়ে থাকা যায়। তাঁর আবার আমার প্রতি উচ্চ ধারণা। সে মনে করে, আমার কান অত্যন্ত পরিষ্কার। গান ভালো হচ্ছে নাকি হচ্ছে না_এটা নাকি আমি অতিদ্রুত ধরতে পারি।

শাওন অন্য স্ত্রীদের চেয়ে আলাদা না। স্ত্রীরা নির্গুণ স্বামীর ভেতরও গুণ আবিষ্কার করে ফেলে।

বিচারকের দায়িত্ব পালন শুরু হলো। আমি কঠিন ভাইভা পরীক্ষা নিচ্ছি_এ রকম মুখ করে বসে থাকি। শাওন চাপা গলায় বলে, ভুরু কুঁচকে আছ কেন? বাচ্চাদের দিকে রাগী রাগী চোখে তাকিয়ে আছ কেন? ওরা ভয় পাচ্ছে। আমার নিজেরই তোমার দিকে তাকাতে ভয় লাগছে, ওরা ভয় পাবে না কেন?

আমি চাপা গলায় বললাম, ওরা আমাকে মোটেই ভয় পাচ্ছে না। তোমাকে ভয় পাচ্ছে। তুমি গানে ভুল ধরছ, আমি ধরছি না।

তুমি একজন বিচারক। ওরা ভুল করলে তুমি ধরবে না!

আমি বললাম, ভুল ধরার যে ছাঁকনি আমার কানে আছে সেটা নষ্ট হয়ে গেছে। আমি ভুল ধরতে পারছি না। যা শুনছি তা- ই মনে হচ্ছে শুদ্ধ।

পাঠকরা বলুন, যে বাচ্চাটি ক্লাস ওয়ানে উঠে মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে তাল- লয়- সুর ঠিক রেখে গান করছে, আমি তার কী ভুল ধরব? ভুল ধরায় আমার কোনো আনন্দ নেই, আমার গান শোনাতেই আনন্দ।

মৃত্তিকা নামের যে মেয়েটি ক্ষুদে গানরাজের প্রধান সমন্বয়কারী, তাকে আমি ছোটবেলা থেকে চিনি; আমার শহীদুল্লাহ হলের বাসায় সে তার বাবার হাত ধরে প্রায়ই আসত। এসেই দৌড়ে টয়লেটে ঢুকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ত বাথটাবে। তখন তাকে হাতি দিয়ে টেনে তোলাও ছিল অসম্ভব। এই মেয়েটি ছিল ক্ষুদে দস্যি। তানিশা নামের আরেকটি মেয়ে, যে উপস্থাপনার কঠিন এবং বিরক্তিকর কাজটি হাসিমুখে করে তাকেও অতি শৈশব থেকে চিনি। সে আরেক দস্যি। তার প্রধান কাজ ছিল, বাইরে থেকে বাথরুমের ফুটো দিয়ে তাকিয়ে থাকা এবং কিছুক্ষণ পর পর বলা_দেখে ফেলেছি, দেখে ফেলেছি।

আসলে ক্ষুদে গানরাজে ঢুকে আমি ক্ষুদেদের জগতে ঢুকে পড়েছি। এতগুলো গানের পাখি, দুজন একসময়কার ক্ষুদে দস্যিদের নিয়ে আমার যাত্রা, অষরপব রহ ড়িহফবৎষধহ ক- এর আশ্চর্য জগতে আমার বিচরণ।

জীবন শুকায়ে গেলে করুণাধারায় আশ্রয় নিতে হয়_রবীন্দ্রনাথ এই পরামর্শ দিয়েছেন। আমার জীবন শুকিয়ে যায়নি। সেই সম্ভাবনা একেবারেই নেই, তার পরও আমি সুরের করুণাধারায় অবগাহন করতে পারছি_এ আমার পরম সৌভাগ্য।

একটাই কষ্টকর ব্যাপার_বাচ্চারা যখন বাদ পড়ে যায়। কী অবাক দৃষ্টিতেই না তারা তাকায়। তাদের চোখের দৃষ্টি বলে দেয়_আমি এত সুন্দর করে গাইলাম আর তোমরা আমাকে বাদ দিয়ে দিলে! বড়দের জগতের নিষ্ঠুরতার পরিচয়ে তাদের ক্ষুদ্র ভুবন হয়ে যায় এলোমেলো। বাদ পড়ে যাওয়া ছেলেমেয়েদের প্রতি কিছু মা- বাবা অত্যন্ত হৃদয়হীন আচরণ করেন। একটি মেয়ে দর্শকদের ভোটের কারণে বাদ পড়ল। সে ব্যাকুল হয়ে কাঁদছে। এর মধ্যে মঞ্চে উপস্থিত হলেন মেয়েটির মা। শুরু করলেন মার। কী আশ্চর্য কাণ্ড। তাঁর মেয়ে ক্ষুদে গানরাজ হবে_এই স্বপ্নে মহিলার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে। তিনি তা জানেন না।

আমাদের ষোল কোটি মানুষের দেশে ষোলজন ক্রিকেট প্লেয়ার নেই, ষোলজন ফুটবল প্লেয়ার নেই, আর এতগুলো গানের পাখি? আমি খুবই অবাক হই। অনুষ্ঠান শেষে বিস্ময়বোধ নিয়ে বাড়ি ফিরি, আবারও বিস্ময় নিয়ে পরের অনুষ্ঠানে যাই। কেউ কেউ বাদ পড়ে, ইয়েলো জোন বা ডেনজার জোনে চলে যায়। তারা গলা ফাটিয়ে কাঁদতে শুরু করে। তাদের কান্না দেখে প্রধান বিচারক মেহের আফরোজ কাঁদেন। অসম্ভব ইন্টারেস্টিং দৃশ্য হিসেবে ক্যামেরা তা রেকর্ড এবং প্রচার করে। আমি ক্যামেরার ব্যাপারটা জানি বলে নিজের চোখ আড়াল করি। শিশুরা কাঁদছে, তানিশা কাঁদছে। দুই বিচারক

www.BDeBooks.Com

কাঁদছে। কোনো মানে হয়?
গানের পাখিদের একটির নাম রানা। সে অবশ্য সারাক্ষণই হাসে। বাদ পড়ে গেলেও দাঁত বের করে হাসে। উচ্চারণ ভয়াবহ খারাপ। আমাকে ডাকে ' ছার' , স্যার না। ছেলেটি খুলনা শহরে রাস্তায় রাস্তায় গান গেয়ে ভিক্ষা করে মা- বাবার সংসার চালাত। এখন ক্ষুদে গানরাজ হওয়ার সম্ভাবনা তার প্রবল। প্রথম দশজনের ভেতর সে চলে এসেছে_ইউরোপ, আমেরিকায় সম্পূর্ণ ভিন্ন এক জগতের হাতছানি এখনই তার জন্য শুরু হয়েছে। তার জন্য অপেক্ষা করছে অন্য এক জগৎ। যে জগৎ ভিক্ষাবৃত্তির জগৎ না।
আরেকটি ছেলের কথা বলি_নাম শান্ত মিয়া। বাড়ি পাবনা। তার মা বিড়ি বেঁধে দৈনিক নয় টাকা পায়। এতে মাতা- পুত্রের সংসার চলে। ছেলেটি প্রথম বারজনের ভেতর চলে এসে বাদ পড়ল। আমাকে এবং শাওনকে কাঁদতে কাঁদতে বলল, এখন আমি কই যাব? মানুষের বাসাবাড়িতে কাজের ছেলের চাকরি নেওয়া ছাড়া আমার আর কোনো পথ নাই। ' আগেও কাজ করি খেতাম, এখনো খাব।'
আমি তাকে বললাম, তোমার মাকে আমি নুহাশ পল্লীতে একটা চাকরি দিতে পারি। তুমি থাকবে তোমার মায়ের সঙ্গে, তোমাকে স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেওয়া হবে। তুমি পড়াশোনা করবে। আগে পড়াশোনা, তারপর গান। রাজি আছ?
শান্ত মিয়া বলল, স্যার আমি রাজি।
মাতা- পুত্র এখন নুহাশ পল্লীতে আছে। শান্ত মিয়া ক্লাস ফাইভে ভর্তি হয়েছে। শান্ত মিয়া অবসর সময়ে একটা কঞ্চি হাতে নুহাশ পল্লীতে একা একা ঘুরে বেড়ায়। নিজের মনের আনন্দে গান করে_
আষাঢ় মাইস্যা ভাসা পানি রে...
উকিল মুন্সীর বিখ্যাত বিচ্ছেদি গান। তার গান নুহাশ পল্লীর বৃক্ষদের স্পর্শ করে। মানুষের কষ্ট সবার আগে টের পায় বৃক্ষরাজি। এই তথ্য আমরা জানি না।

পাদটীকা
(পরাজয় সহ্য করা সবার জন্যই কঠিন, আবার শুরুতেই সাফল্যের ধাক্কাও অনেকেই হজম করতে পারে না।)

কুইজ
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে নালিশ গেছে। ভুল- ভাল উচ্চারণে জনৈক উর্দুভাষী (হিন্দিও হতে পারে) গায়ক তাঁর দুটি বিখ্যাত গান রেকর্ড করে ফেলেছেন। রেকর্ড দুটি এই মুহূর্তে প্রত্যাহার করা উচিত।
রবীন্দ্রনাথ মন দিয়ে রেকর্ড শুনে বললেন, গায়কের কণ্ঠের মাধুর্যে উচ্চারণের ত্রুটি ঢাকা পড়ে গেছে। রেকর্ড দুটি থাকবে। গায়কের নাম কী?
উত্তর : কে এল সায়গল
(গায়ক এবং অভিনেতা)

www.BDeBooks.Com

১৩
অপেক্ষা

মানবজীবন হলো অপেক্ষার জীবন। ছোটখাটো অপেক্ষা দিয়ে জীবনের শুরু_মা কি আমাকে চকলেট কিনে দেবে? বাবা কি আজ ঘোড়া ঘোড়া খেলবে? বাবা ঘোড়া হবে, আমি তার পিঠে উঠে হেট হেট করব।
জীবনের শেষে অপেক্ষার ধরন সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। তখন অপেক্ষা মৃত্যুর। এই মৃত্যুকে মহিমান্বিত করার অনেক চেষ্টা করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, ' মরণরে তুঁহু মম শ্যাম সমান।' মহাপুরুষদের কাছে মৃত্যুর অপেক্ষা হয়তো বা আনন্দময়। আমি সাধারণ অভাজন হওয়ার কারণে মৃত্যুচিন্তা মাথায় এলে অস্থির হয়ে যাই। আমি চলে যাব তার পরেও আকাশ ভেঙে জোছনা নামবে, ' সবাই যাবে বনে' । আষাঢ় মাসে আকাশ অন্ধকার করে মেঘ জমবে। তরুণীরা বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে গাইবে, ' এসো করো স্নান নবধারা জলে' । সেই অপূর্ব নবধারা জল দেখার জন্যে আমি থাকব না, এর কোনো মানে হয়?
প্রসঙ্গ আপাতত থাকুক। নানাবিধ অপেক্ষার গল্প করা যাক। আধুনিক নগরজীবনে নতুন কিছু ' অপেক্ষা' র সৃষ্টি হয়েছে, যা আগে ছিল না। যেমন, গাড়িতে বসে, গরমে সিদ্ধ হতে হতে ' যানজট' খোলার অপেক্ষা। এই অপেক্ষা অর্থবহ করার অনেক চেষ্টা আমি করেছি, যেমন গাড়ির সিট পকেটে সহজে হজম হয় এমন বই। অ্যাসিমভের, ' ইড়ড়শ ড়ভ ঋধপঃংঃ' . উন্মাদ পত্রিকার সম্পাদক আহসান হাবীবের কিছু রসিকতার বই। রিপ্লের একটা বই, যেখানে উদ্ভট উদ্ভট কাহিনী। এর বাইরে আছে মোবাইল ফোনে সাপের খেলা।
জ্যামে আটকা পড়লে কোনো কিছুই ভালো লাগে না। বইয়ের পাতা খুলতেই পারি না। মোবাইল ফোনের সাপ নিয়ে তখন খেলতে বসি। সাপকে আপেল, চেরি ফল খাইয়ে লম্বা করাই হলো খেলার নিয়ম। কিছুক্ষণ সাপকে খাওয়ানোর পরে মনে হয় এখন কী করা যায়? অন্যদের কথা জানি না, জ্যামে আটকা পড়লে অবধারিতভাবে আমার ছোট বাথরুম পায়। তখন গভীর শঙ্কা নিয়ে ভাবি, আগামী তিন ঘণ্টায় যদি জ্যাম না ছোটে তাহলে কী কেলেংকারি হবে কে জানে!
যানজটে সবাই অসুখী হন তা- না। ভিক্ষুক এবং ফেরিওয়ালারা দন্ত বিকশিত করে হাসেন। ভিক্ষুকের হাত থেকে বাঁচার কূটকৌশল একজন আমাকে শিখিয়েছেন। ভিক্ষুক যখন ভিক্ষা চাইবে তখন তাদের দিকে তাকানো যাবে না। ভাব করতে হবে, ভিক্ষুকরা অদৃশ্য মানব। এদেরকে দেখা যাচ্ছে না। ' মাফ করেন' _বাক্যটাও ওদের দিকে তাকিয়ে বলা যাবে না। চোখে চোখ পড়লেই নাকি ধরা খেতে হয়।
জলজ্যান্ত মানুষকে অদৃশ্য মানব ভাবা কঠিন কর্ম। আমি ভিক্ষুকদের দিকে তাকাই। যথেষ্ট বিনয়ের সঙ্গে বলি, মাফ করেন। মাফ চাইতে গিয়ে আমার জীবনে একটা ঘটনা ঘটেছে। জনৈক ভিক্ষুক বলেছে, স্যার, সকাল থাইকা আমি খালি মাফই করতেছি। আর কত মাফ করব?
এমন বুদ্ধিদীপ্ত সংলাপ ভিক্ষুকের কাছ থেকে আশা করা যায় না। আমি মানিব্যাগ খুলে ১০০ টাকার একটা নোট বের করলাম।
কয়েকদিন আগে পত্রিকায় একজন ভিক্ষুকের ছবি ছাপা হয়েছে। সে নাকি ভিক্ষা করে কোটিপতি হয়েছে। সে তার সন্তানদের সমাজে আদর্শ ভিক্ষুক হিসেবে দেখতে চায় এবং তাদের সাফল্য কামনা করে।
ইদানীং পত্রিকায় কোটিপতিদের নিয়ে ফিচার হচ্ছে। কেউ কাঁচামরিচের ক্ষেত করে কোটিপতি, কেউ ঝিংগা চাষ করে কোটিপতি। কোটিপতিদের ছবিও ছাপা হয়। ছবিতে তাঁদের অত্যন্ত বিমর্ষ দেখায়। কোটিপতি হয়ে তাঁরা এমন বিমর্ষ কেন কে জানে! পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে একেক ধরনের খবরের জোয়ার আসে। একটা সময় গেছে গাই গরুর। সবাই গাই গরু পাচ্ছে। তাদের ছবি ছাপা হচ্ছে। বেশির ভাগ সময়েই চিন্তিত কৃশকায় এক তরুণী গরুর দড়ি ধরে ভীত চোখে গরুর দিকে তাকিয়ে থাকে। এখন জোয়ার চলছে কোটিপতির। সম্প্রতি পড়লাম শামুক বিক্রি করে কোটিপতি।
অপেক্ষা বিষয়ে বলতে গিয়ে অন্য বিষয়ে চলে এসেছি। মূল বিষয়ে আসা যাক। অপেক্ষার শ্রেণীভেদ_

www.BDeBooks.Com

কসাইয়ের অপেক্ষা

কসাই অপেক্ষা করে একদিন তার ছেলে এমন নামি কসাই হবে, যে একটা আস্ত গরু এক ঘণ্টায় নামিয়ে ফেলবে।

ছাত্রলীগের অপেক্ষা

পড়াশোনা, ভালো রেজাল্ট_এই সব নিয়ে তারা মাথা ঘামায় না, তাদের অপেক্ষা টেন্ডার নিয়ে। তারা বাকি জীবন ছাত্রলীগের সেবা করে যেতে চায়। সময় হলে বয়স্কভাতার জন্যে আবেদনের ইচ্ছাও তারা পোষণ করে। বর্ষাকালে ' কই' মাছ উজায়। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসা মানে ছাত্রলীগের বর্ষাকাল। তারা একসঙ্গে ' উজায়া' যায়।
তাদের থামানোর নানান চেষ্টার কথা শুনছি। কোনোটিই মনে হয় কাজ করছে না।
লিচু খাওয়া নিয়ে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপ মারামারি করেছে। দশ জন আহত। এই খবর কিছুক্ষণ আগে পড়েছি। লিচুর পরপরই আমের সিজন আসছে। ভয়ে আছি, তখন না জানি কী হয়।
আমি তখন শহীদুল্লাহ হলের হাউস টিউটর। শহীদুল্লাহ হল ছাত্রলীগের এক কর্মী কী একটা কাজে যেন এসেছে। আমি তাকে বললাম, এই তোমরা তো আওয়ামী লীগের লেজ।
সেই ছেলে চোখ কপালে তুলে বলল, স্যার এটা কী বলেন? আওয়ামী লীগ আমাদের লেজ।
সাম্প্রতিক ঘটনা দেখে ওই ছাত্রের কথাই ঠিক বলে মনে হচ্ছে।

ডাক্তারদের অপেক্ষা

তাদের অপেক্ষা রোগের জন্যে। তাদের কোনো জাতীয় সংগীত থাকলে তার প্রথম পঙ্ক্তি হতো_' আয় রোগ আয়, উড়াল দিয়ে আয়।'
কিছুদিন আগে হৃদয়ঘটিত সমস্যা নিয়ে ল্যাবএইডে ডাক্তার বরেন চক্রবর্তীর কাছে গিয়েছিলাম। বরেন চক্রবর্তী লেখক মানুষ বলেই লেখকদের বিশেষ খাতির করেন। অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাওয়ার জন্যে চার ঘণ্টা প্লাস্টিকের লাল চেয়ারে বসে থাকতে হয় না। দেড় থেকে দুই ঘণ্টার মধ্যে ভেতরে ডাক পড়ে।
বরেন চক্রবর্তী যে রসিক মানুষ তা জানা ছিল না। তাঁর একটি রসিকতায় যথেষ্ট মজা পেয়েছি। পাঠকদের সঙ্গে রসিকতাটা ভাগাভাগি করা যেতে পারে।
বরেন চক্রবর্তীর নিয়ম হচ্ছে, রোগীকে বিছানায় শুইয়ে প্রথমেই রোগীর দুই পায়ের পাতা স্পর্শ করা (পালস দেখার জন্যে)। একদিন তা- ই করছেন। রোগী বলল, শুরুতেই আপনি পায়ে ধরেন কেন?
বরেন চক্রবর্তী বললেন, ইচ্ছা করে কি আর পায়ে ধরি? বিবেকের দংশনে পায়ে ধরি।
রোগী : ব্যাপারটা বুঝলাম না। কিসের বিবেকের দংশন?
বরেন চক্রবর্তী : এই যে আপনার চিকিৎসা শুরু হলো। ল্যাবএইড হাসপাতালে ভর্তি হবেন। জলের মতো টাকা যাবে। আপনার অর্থ ব্যয়ের পেছনে আমার একটা ভূমিকা আছে বলেই বিবেকের তাড়নায় প্রথমেই আপনার পায়ে ধরছি।
ল্যাবএইড কর্তৃপক্ষ ডাক্তার বরেন চক্রবর্তীর রসিকতা কিভাবে নেবে কে জানে! তবে ক্ষমতাধর সব রাজনৈতিক নেতাই ডাক্তার বরেন চক্রবর্তীর বাঁধা রোগী। ডাক্তার বরেনের জন্যে এটা একটা আশার কথা।

ভয়ঙ্কর অপেক্ষা

বঙ্গবন্ধুর খুনিদের দীর্ঘদিবস দীর্ঘরজনী ফাঁসির অপেক্ষাকে আমি বলব ভয়ঙ্কর অপেক্ষা। প্রতি মুহূর্তেই মৃত্যুকে চোখের

www.BDeBooks.Com

সামনে দেখা। এদের একজন মহিউদ্দিনকে যখন ফাঁসিতে ঝোলানো হচ্ছে তখন সে জল্লাদদের বলল, আমি অসুস্থ মানুষ। আমাকে কি ক্ষমা করা যায় না? জানি না সেই সময় শিশু রাসেলের জলভরা করুণ মুখের ছবি একবারও তার মনে পড়েছিল কি না।

যুদ্ধ- অপরাধীদের অপেক্ষা

তারা অবশ্যই নাজাতের অপেক্ষায় আছে। ' ঊাবৎুনড়ফু রং ঢ়ধরফ নধপশ নু যরং ড়হি পড়রহ' _এই ইংরেজি আপ্তবাক্যটি তাদের মর্মমূলে পেঁ ৗছেছে বলেই আমার ধারণা।

পাদটীকা

বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকায় অভিনেতা সোহেল রানা আমাকে উদ্দেশ করে কিছু কথা বলেছেন। যেমন_ছবি নামে আমি যেসব রসগোল্লা বানিয়েছি তা কেউ দেখে না।
অতি সত্যি কথা। ছবি বানানোর শখ পূরণের জন্যে আমি অনেক টাকাই নষ্ট করেছি। ভবিষ্যতেও করব। ন্যাড়া একবার বেলতলায় যায়, আমার মাথায় এখনো কিছু চুল অবশিষ্ট আছে বলে বারবার বেলতলায় যাই।
সোহেল রানার দ্বিতীয় বক্তব্য_" আপনি দেশ নিয়ে স্বাধীনতার ৩০ বছরেরও বেশি সময় পরে ' জোছনা ও রজনীর গল্প' উপন্যাসটি লিখেছেন। সত্যিকার দেশপ্রেম আপনার মধ্যে থাকলে আপনি অনেক আগেই এ ধরনের লেখা লিখতেন। এ থেকেই আপনার দেশপ্রীতি যে কতটুকু তা বোঝা যায়। তাই আপনি ভারতীয় ছবির পক্ষে লিখবেন, বলবেন_এতে তো অবাক হবার কিছু নেই।"
আমার দেশপ্রেমের অবস্থা সর্বনিম্ন পর্যায়ের, তা জেনে শঙ্কিত বোধ করছি। এখন কী করা যায়? কোনো একদিন দেশপ্রেম জাগ্রত হবে তার জন্যে অপেক্ষা? অপেক্ষায় থাকলাম।

কুইজ

বাথরুমে যে টয়লেট পেপার ব্যবহার করা হয় তা কাদের আবিষ্কার?
উত্তর : চীনাদের (১৩৯১ সন)।
ফিলাডেলফিয়ার টয়লেট পেপারের রোল বাজারে আনে ১৮৭৯ সালে।
আমি আমেরিকার এক হোটেলে বিন লাদেনের ছবি ছাপা টয়লেট পেপার দেখেছি।

www.BDeBooks.Com

১৪.

স্বপ্ন ও দুঃস্বপ্ন

দুঃস্বপ্ন নিয়ে লেখা সাইকোলজির একটা বই পড়ছিলাম, মানুষ কী দুঃস্বপ্ন দেখে, কেন দেখে তা- ই বিতং করে লেখা। আমি আমার দুঃস্বপ্নগুলি বইয়ের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে গিচ্ছিলাম। বই পড়ে জানলাম, মানুষ সবচেয়ে বেশি যে দুঃস্বপ্ন দেখে তা হচ্ছে উঁচু জায়গা থেকে পতন। এই পতনের শেষ নেই। একসময় সে আতঙ্কে জেগে ওঠে।

এই বিশেষ দুঃস্বপ্ন আমি যৌবনকালে দেখতাম। এখন আর দেখি না। বইয়ে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে_এই দুঃস্বপ্ন অসহায়ত্বের প্রতীক। কেউ যদি অসহায় বোধ করে তখনই এই দুঃস্বপ্ন দেখে। হয়তো যৌবনে আমি অসহায় বোধ করতাম।

দ্বিতীয় দুঃস্বপ্ন যা মানুষ প্রায়ই দেখে, তা হচ্ছে জনসমক্ষে নিজেকে নগ্ন অবস্থায় আবিষ্কার করা। নিজের সম্মান নিয়ে যারা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, তারাই নাকি এই দুঃস্বপ্ন দেখেন। আমি নিজে কয়েকবার নগ্ন অবস্থায় নিজেকে বিশিষ্টজনদের সঙ্গে দেখেছি। স্বপ্নে পুরো ব্যাপারটা স্বাভাবিক মনে হয়েছে।

আজকাল কেন জানি স্বপ্ন- দুঃস্বপ্ন কোনোটাই দেখি না। গভীর রাতে ঘুমাতে যাই। এমনিতেই আমার ঘুম ভালো হয়, তারপরও ডাক্তারের পরামর্শে ডিজোপেন নামের একটা ঘুমের ওষুধ খাই। সাইকিয়াট্রিস্ট এবং লেখিকা আনোয়ারা সৈয়দ হক আমি ডিজোপেন খাই শুনে আঁতকে উঠে বলেছিলেন, এটা তো পাগলের ওষুধ। আপনি পাগলের ওষুধ খাচ্ছেন কেন?

আমি বিনয়ের সঙ্গে বলেছি, আমি তো পাগলই!

কড়া ঘুমের ওষুধ মাথা থেকে স্বপ্ন তাড়িয়ে দেয়। যারা ঘুমের ওষুধ খায় তাদের স্বপ্ন দেখার কথা না, তারপরও কয়েক দিন আগে স্বপ্নে দেখলাম, আমি ক্লাস নিচ্ছি। একদল ছাত্র গম্ভীর মুখে বসে আছে। আমি তাদেরকে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের চধৎঃরপষব রহ ধ নড়ী ঢ়ৎড়নষবস পড়াচ্ছি। হঠাৎ লক্ষ করলাম আমার প্যান্টের ফ্লাই খোলা। প্রবল আতঙ্কে ঘুম ভেঙে গেল। বিছানায় বসে আছি আর ভাবছি, এই স্বপ্নটা কেন দেখলাম? বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা মিস করছি বলে দেখছি? ক্লাসে পড়াচ্ছি ঠিক আছে, প্যান্টের ফ্লাই খোলা কেন? এর অর্থ কী? সাইকিয়াট্রিস্টরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা নিয়ে চিন্তা করতে থাকুন, এই ফাঁকে আমি বলে ফেলি যে অধ্যাপনার বিষয়টা আমি ' মিস' করি। ' মিস' করার ভালো বাংলা পাচ্ছি না বলে ইংরেজি শব্দটাই লিখলাম। বাংলায় মিস করা হলো অভাববোধ, দুঃখবোধ। কোনোটাই মূল ইংরেজি শব্দের সঙ্গে যাচ্ছে না।

অধ্যাপনার সময়টা ছিল আমার অর্থকষ্টের কাল। টেলিভিশন কেনার সামর্থ্য ছিল না বলে বাসায় টেলিভিশন ছিল না। হাতের কাছের সমুদ্রে পা ভেজানোর সামর্থ্যও ছিল না। তারপরও দুঃখে- কষ্টে সময়টা ভালো কেটেছে। কেমিস্ট্রির দুরূহ বিষয় ছাত্রদের কাছে পরিষ্কার করতে পারছি_এই আনন্দ তুলনাহীন।

বহিরাগত পরীক্ষক হয়ে তখন বরিশাল- পটুয়াখালী যেতাম। যাওয়া- আসার ঞঅ, উঅটা সংসারের কাজে আসত। ঢাকা থেকে লঞ্চ ছাড়ত সন্ধ্যাবেলায়। লঞ্চের ডেকে একা বসে থাকার আনন্দও ছিল সীমাহীন। আজকাল একা থাকতে পারি না। সব সময় আশপাশে মানুষজন লাগে। মানসিক এই পরিবর্তন কেন হচ্ছে কে জানে!

আমি বহিরাগত একজামিনার হিসেবে সবচেয়ে বেশি গিয়েছি বরিশাল বিএম কলেজে। আমার থাকার ব্যবস্থা হতো কেমিস্ট্রির ল্যাবরেটরির একটা ঘরে। ঘরভর্তি মাকড়সা মেঝেতে তেলাপোকা। ল্যাবরেটরি গাছপালার মাঝখানে। সন্ধ্যার পর পরিবেশ ভুতুড়ে হয়ে যেত। অধ্যাপক নিজের বাড়ি থেকে ভদ্রতা করে খাবার আনতেন তা- না। বহিরাগত পরীক্ষকের ' সেবা' র জন্য ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে চাঁদা তোলা হতো।

রাত ৯টার পর রসায়নের কোনো এক অধ্যাপকের বাসা থেকে খাবার আসত। রাত ৯টাতেই মনে হতো নিশুতি রাত। মশারি খাটিয়ে মশারির ভেতর বসে থাকতাম। ঘুম আসত না। মাকড়সা, তেলাপোকা ছাড়াও অন্য একটি ভয় আমাকে আচ্ছন্ন করত। সেটা হলো ভূতের ভয়। এতে একটা লাভ অবশ্যি হয়েছে, আমি বেশ কিছু ভূতের গল্প লিখেছি।

বিএম কলেজে দিনযাপনের একটা গল্প বলা যেতে পারে। এক সন্ধ্যায় মধ্যবয়স্ক এক মহিলা বিশাল বাহারি কাজ করা

www.BDeBooks.Com

পিতলের টিফিন ক্যারিয়ার নিয়ে উপস্থিত হলেন। তাঁর সাজগোজ দেখার মতো। হাতভর্তি সোনার গয়না (সেই সময় নকল গয়নার চল শুরু হয়নি)। গলায় চন্দ্রহার। ভদ্রমহিলা অতি পরিচিতজনের গলায় বললেন, হুমায়ূন ভাই ভালো আছেন?
আমি বললাম, জি। আপনাকে চিনতে পারলাম না।
ভদ্রমহিলা তাঁর নাম বললেন। তিনি যে আমার কিছু বই পড়েছেন সে তথ্য জানালেন। টিফিন ক্যারিয়ারভর্তি পোলাও, কোর্মা, ঝালমাংস এবং ইলিশ মাছ ভাজা এনেছেন তাও শুনলাম।
একজন নতুন প্রায় অখ্যাত লেখকের জন্য বিপুল আয়োজন আমাকে বিস্মিত করল। ভদ্রমহিলা জানালেন, তিনিও একজন লেখিকা। একটা উপন্যাস সম্প্রতি লিখে শেষ করেছেন। উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। আমাকে পাণ্ডুলিপি পড়তে হবে।
আমি বললাম, আপনি পাণ্ডুলিপি রেখে যান। আমি আগ্রহ নিয়ে পড়ব।
ভদ্রমহিলা বললেন, পাণ্ডুলিপি রেখে গেলে আপনি পড়বেন না। তার চেয়েও বড় কথা, আমি আমার পাণ্ডুলিপি কখনো হাতছাড়া করি না। বলা তো যায় না, কোত্থেকে কী হয়। আমি নিজে আপনাকে পড়ে শোনাব।
কত পৃষ্ঠার পাণ্ডুলিপি?
চার শ' পৃষ্ঠার।
চার শ' পৃষ্ঠার পাণ্ডুলিপি পড়তে আপনার কতক্ষণ লাগবে?
আট ঘণ্টা লাগবে। আমি একজনকে পড়ে শুনিয়েছিলাম। আট ঘণ্টা পঁচিশ মিনিট লেগেছে।
সারা রাত আপনি আমাকে পাণ্ডুলিপি পড়ে শোনাবেন?
আমি খবর নিয়েছি আপনি আরো চার দিন আছেন। আমি রোজ সন্ধ্যায় এসে দুঘণ্টা পড়ব। সময় নষ্ট না করে শুরু করে দেই?
আমি তখন পুরোপুরি হতাশ। এই মহিলার হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার কোনো পথ দেখছি না।
প্রতি সন্ধ্যায় কালজয়ী কোনো লেখাও আমি লেখকের মুখ থেকে শুনব না।
ভদ্রমহিলা বললেন, হুমায়ূন ভাই, এটা একটা প্রেমের করুণ উপন্যাস। নৌকাতে নায়ক- নায়িকার প্রেম হয়। নৌকা ঝড়ের মধ্যে পড়ে। নায়িকা সাঁতার জানে না। তাকে বাঁচাতে গিয়ে নায়কেরও সলিল সমাধি হয়। দুজনকে উদ্ধারের পর দেখা যায়, দুজন দুজনকে জড়িয়ে ধরে মরে পড়ে আছে। পড়া শুরু করি?
আমি হতাশ গলায় বললাম, করুন।
ভদ্রমহিলা পাঠ শুরু করলেন। তাঁর উপন্যাসের প্রথম বাক্য_' নৌকার মাঝি বদর বদর বলে নৌকা ছেড়ে দিল।'
আমি বললাম, থামুন। আমি ভাটি অঞ্চলের দিকের মানুষ। জীবনে অসংখ্যবার নৌকায় চড়েছি। কখনো শুনিনি কোনো মাঝি বদর বদর বলে নৌকা ছাড়ে। আপনি শুনেছেন?
না।
তাহলে কেন লিখেছেন, মাঝি বদর বদর করে নৌকা ছেড়ে দিল? আপনার পর্যবেক্ষণে ভুল আছে। আপনি আশপাশে কী হয় দেখেন না। আপনার লেখা কিছু হবে বলে আমি মনে করি না। আমি আপনার লেখা শুনব না।
পুরোটা না শুনলে কিভাবে বুঝবেন?
হাঁড়ির ভাত সিদ্ধ হয়েছে কি না জানার জন্য একটা ভাত টেপাই যথেষ্ট।
প্রতিটি ভাত টিপতে হয় না। আপনার ভাত সিদ্ধ হয় নাই। আপনার নিজের ভাত সিদ্ধ হয়েছে? নিজেকে আপনি কী মনে করেন?
ভদ্রমহিলা যথেষ্ট চেঁচামেচি করে টিফিন ক্যারিয়ার ফেরত নিয়ে চলে গেলেন।
আমার মাংস- পোলাও খাওয়া হলো না।
এ ধরনের সমস্যা আমার এখনো মাঝে মাঝে হয়। তার একটা গল্প বলি। এক তরুণী কবি আমাকে কবিতার বই দিতে এসেছে। বইটা তাকে নিজ হাতে আমাকে দিতে হবে, কারণ কবি বইটা আমাকে উৎসর্গ করেছে। এটি তার প্রকাশিত

www.BDeBooks.Com

দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ।

আমি তাকে বাসায় আসতে বললাম। চব্বিশ- পঁচিশ বছর বয়সী এক তরুণী। বিষাদগ্রস্ত চেহারা। খুবই অস্থিরমতি। স্থির হয়ে তাকাচ্ছেও না।

আমাকে তার দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ উৎসর্গ করার জন্য তাকে ধন্যবাদ দিলাম।

সে বলল, স্যার, আমি আপনার কিছু সময় নেব। সবগুলি কবিতা আমি নিজে আপনাকে পড়ে শোনাব। আপনি না বললে শুনব না।

বলেই সে অপেক্ষা করল না। বই খুলে কবিতা আবৃত্তি শুরু করল। চটি বই কবিতা পড়ে শেষ করতে আধঘণ্টার মতো লাগল। আমি বললাম, ভালো হয়েছে। কবি হতাশ গলায় বলল, ভালো হয়েছে বলে শেষ করলে হবে না। আপনার অনুভূতি পুরোপুরি ব্যাখ্যা করতে হবে। কেন ভালো হয়েছে সেটা বলবেন। প্রতিষ্ঠিত কবিদের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা করবেন।

আমি বললাম, তাহলে বলব ভালো হয়নি।

কেন?

তুমি ছন্দ বলে যে একটা ব্যাপার আছে তা- ই জানো না।

আমি লিখি আমার নিজস্ব ছন্দে। ছন্দের পুরনো ধারণায় আমি বিশ্বাসী না।

কবিতার নানান ছন্দ আছে_এই বিষয়টা কি তুমি জানো?

হুঁ।

দু- একটা ছন্দের নাম বলতে পারবে?

এখন মনে পড়ছে না। শুধু অমিত্রাক্ষর ছন্দের নাম মনে আসছে। মাইকেল মধুসূদনের আবিষ্কার।

পয়ার ছন্দ জানো?

না।

আমি বললাম ' চিরসুখী জন ভ্রমে কি কখন
ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে
কী যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে
কভু আশীবিষে দংশেনি যারে।' এটি কোন ছন্দে লেখা বলতে পারবে?

না।

আমি বললাম, ছন্দের নাম ' ললিত' । ললিতের অনেক ভাগ আছে। যেমন_ভঙ্গ ললিত, মিশ্র ললিত, ললিত ত্রিপদী, ললিত চতুষ্পদী, ভঙ্গ ললিত চতুষ্পদী।

আপনি কি প্রমাণ করতে চাইছেন যে আপনি ছন্দবিশেষজ্ঞ?

আমি কিছুই প্রমাণ করতে চাইছি না। একবার আমার ছবির জন্য গান লেখার প্রয়োজন পড়ল। তখনই ছন্দ বিষয়ে পড়াশোনা করেছি। তোমার প্রতি আমার উপদেশ হলো, ছন্দ বিষয়টা পুরোপুরি জেনে তারপর কবিতা লিখবে।

বরিশালের মহিলা টিফিন ক্যারিয়ার নিয়ে চলে গিয়েছিলেন, এই কবি তার বই ফেরত নিয়ে চলে গেল। যাবার আগে অপমানসূচক একটি বাক্য বলে গেল। সেই বাক্যটি বলতে ইচ্ছা করছে না। অভিমানী কবি যা ইচ্ছা বলতে পারেন।

পাদটীকা

happily however, there are also books that talk like men.
ÑTheodor Haecker.

কিছু মানুষ আছে যারা বইয়ের মতো কথা বলে। আনন্দের বিষয় হচ্ছে, কিছু বই আছে মানুষের মতো কথা বলে।

www.BDeBooks.Com

_থিওডর হেকার।

কুইজ
এভারেস্ট বিজয়ী বাংলাদেশি তরুণ মুসা ইব্রাহীমের বাবার নাম কী?
উত্তর: মো. আনসার আলী।
(মুসা ইব্রাহীম! অভিনন্দন, বাপকা ব্যাটা)।

১৪
নামধাম

মানুষের প্রথম পরিচয় তার নাম। দ্বিতীয় পরিচয় কি ' ধাম' ? নামধাম একসঙ্গে উচ্চারিত হয় বলেই এই জিজ্ঞাসা। আমি মনে করি না, নামধাম মানুষের পরিচয়। চুরুলিয়াতে কাজী নজরুল নামের আরেকজন থাকলেই দুই নজরুলের এক পরিচয় হবে না। যদিও তাদের নামধাম এক।
নাম বিষয়ে আজকের লেখা পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোরআন শরিফের উদ্ধৃতি দিয়ে শুরু করি। সুরা বাকারায় আল্লাহপাক বলছেন, " আমি আদমকে প্রতিটি বস্তুর ' নাম' শিখিয়েছি।" এখানে ' নাম' নিশ্চয়ই প্রতীকী অর্থে এসেছে। নাম হলো বস্তুর ধর্ম। আল্লাহপাকের অনুগ্রহে আল্লাহপাক যে জ্ঞান আদমকে দিলেন সব ফেরেশতা তা থেকে বঞ্চিত হলো।
আমরা মানব সন্তানরা বস্তুর নাম জানি। আগ্রহ নিয়ে নতুন নতুন নাম দেই। গ্যালাক্সির নাম দিলাম ' এনড্রমিডা' । মঙ্গলগ্রহের দুই চাঁদের একটির নাম দিলাম ' ডিমোস' , আরেকটি ' ফিবোস' ।
কিছু কিছু নাম আমরা আবার বাতিলও করে দেই। উদাহরণ ' মীরজাফর' । বাংলাদেশের কোনো বাবা- মা ছেলেমেয়ের নাম ' মীরজাফর' রাখবেন না। ' মীরজাফর' এবং ' বিশ্বাসঘাতকতা' আজ সমার্থক। মীরজাফরের চেয়েও বড় বিশ্বাসঘাতক ছিল সিরাজের হত্যাকারী মিরন। তার প্রতি আমাদের তেমন রাগ নেই, যেমন আছে মীরজাফরের প্রতি। মিরন নাম নিষিদ্ধ না, কিন্তু মীরজাফর নিষিদ্ধ। কেন?
কুখ্যাতদের নামে বাবা- মা তাঁদের সন্তানদের নাম রাখেন না, আবার অতি বিখ্যাতদের নামেও রাখেন না। ইংল্যান্ডের বাবা- মারা তাঁদের সন্তানের নাম শেক্সপিয়র রাখেন না। আইনস্টাইন নাম রাখা হয় না। তবে আমেরিকার ফার্গো শহরে আমার এক অধ্যাপকের কুকুরের নাম ছিল আইনস্টাইন। তিনি আইনস্টাইনকে সম্মান দেখানোর জন্য তাঁর প্রিয় কুকুরের এই নাম রেখেছিলেন।
চিন্তায় এবং কর্মে আমেরিকানদের মতো জাতি দ্বিতীয়টি নেই। তাদের দুটো নামের নমুনা দেই (এই দুজন নর্থ ডাকোটা স্টেট ইউনিভার্সিটিতে আন্ডার গ্র্যাজুয়েট ক্লাসের ছাত্র)
Mr. Long frog (লম্বা ব্যাঙ)

www.BDeBooks.Com

Mr Fox (শিয়াল)

এখন আমার নিজের নামের জটিলতা বিষয়ে বলি। ১৯৭২ সাল। মা গিয়েছেন বাবার প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা তুলতে। টাকা তুলতে পারলেন না। কারণ বাবা কোনো এক অদ্ভুত কারণে মাকে প্রভিডেন্ট ফান্ডের নমিনি করে যাননি। তিনি নমিনি করে গেছেন তাঁর বড় ছেলেকে। কাজেই আমি গেলাম। আমিও টাকা তুলতে পারলাম না। কারণ বাবা তাঁর ছেলের নাম লিখেছেন শামসুর রহমান। আমার নাম হুমায়ূন আহমেদ। আমি বিনয়ের সঙ্গে বললাম, আমার বাবার অনেক অদ্ভুত স্বভাবের একটি হচ্ছে তিনি কিছুদিন পর পর ছেলেমেয়েদের নাম বদলাতেন। শুরুতে আমার নাম ছিল শামসুর রহমান। তিনি আমার নাম বদলে হুমায়ূন আহমেদ রেখেছেন, কিন্তু এই তথ্য প্রভিডেন্ট ফান্ডের কাগজপত্রে দিতে ভুলে গেছেন। যাকে এত কথা বলা হলো তিনি মুখ গম্ভীর করে বললেন, আপনি প্রমাণ করুন যে, শুরুতে আপনার নাম ছিল শামসুর রহমান।

আমি অতি দ্রুত তা প্রমাণ করলাম। ভদ্রলোকের হাতে এক শ টাকা ধরিয়ে দিলাম। জীবনে প্রথম কাউকে ঘুষ দেওয়া।

আমাদের নবীজি (দ.) সন্তানের নামকরণ বিষয়ে উপদেশ দিয়ে গেছেন। তিনি বলেছেন, তোমরা সন্তানদের জন্য সুন্দর সুন্দর নাম রাখবে। যেমন, আসিয়া নামটা রাখবে না। আসিয়া নামের অর্থ দুঃখিনী। দুঃখিনী নাম কেন রাখবে?

আমার বড় চাচির নাম আসিয়া। দুঃখে দুঃখে তাঁর জীবন কেটেছে। শেষজীবনে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।

আমরা বাংলাদেশি মুসলমানরা ছেলেমেয়েদের ইসলামী নাম রাখতে আগ্রহী। আল্লাহর নামের সঙ্গে মিলিয়ে নাম। যেমন_আব্দুল কাদের (আল্লাহর দাস), গোলাম রসুল (রসুলের গোলাম)।

আল্লাহর নামের সঙ্গে মিলিয়ে কখনো কোনো মেয়ের নাম কেন রাখা হয় না? আল্লাহপাক তো নারী- পুরুষের ঊধর্ব্বে, তারপরেও তাঁর নাম পুরুষবাচক কেন ভাবা হয়? এই বিষয়ে জ্ঞানীরা কেউ কি আমার প্রশ্নের জবাব দেবেন?

বাংলাদেশের শিক্ষিত এবং ২১ ফেব্রুয়ারির ভাবে উজ্জীবিতরা সন্তানদের জন্য বাংলা নাম খোঁজেন, তবে ডাকনাম। ভালো নাম অবশ্যই ইসলামী।

বাংলা নাম নিয়ে আমি আছি বিপদে। অনেকেরই ভুল ধারণা আছে যে লেখকরা সুন্দর সুন্দর নাম জানেন। আমি কিন্তু জানি না। তাতে রক্ষা নেই, পরিচিতজনদের নাম দেওয়ার জন্য আমাকে প্রস্তুত থাকতে হয়। সিলেটের নাট্যকর্মী আরজুর ছেলে হয়েছে। নামের জন্য দিনে চার- পাঁচবার টেলিফোন। আকিকা আটকে আছে।

আমি বললাম, নাম রাখো ' মানব' ।

আরজু বিস্মিত হয়ে বলল, স্যার, সে তো মানবই, অন্য কিছু তো না। তাহলে মানব কেন রাখব?

আমি বললাম, সেটাও একটা কথা। এক মাস সময় দাও নাম ভাবতে থাকি।

না স্যার, খাসি কেনা হয়ে গেছে। আজই নাম রাখা হবে। মানবই রাখা হবে।

হবিগঞ্জের আরেক অভিনেতার নাম সোহেল। তার প্রথম ছেলে হয়েছে। নামের জন্য অস্থির। নাম আমাকেই রাখতে হবে।

আমি বললাম, যেহেতু প্রথম সন্তান নাম রাখো প্রথম।

সোহেল বলল, নাম খুবই পছন্দ হয়েছে স্যার। অদ্ভুত।

এক বছর না ঘুরতেই আবারও তার এক ছেলে। তার নাম রাখলাম দ্বিতীয় এবং সোহেলকে বললাম, তৃতীয় ছেলেমেয়ে যাই হয় আমার কাছে নাম চাইবে না। সরাসরি নাম রাখবে তৃতীয়। পরেরজন চতুর্থ, তারপরের জন পঞ্চম... এইভাবে চলবে। ঠিক আছে?

জি স্যার, ঠিক আছে।

সম্প্রতি ছেলের নামের জন্য আমার কাছে এসেছে অভিনেতা মিজান। আমি বললাম, নাম রাখ ' লুব্ধক' ।

মিজান মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, লুব্ধক জিনিসটা কী স্যার?

আমি বললাম, আকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্র।

মিজান- পুত্র এখন আকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

কেউ যখন আর্কিটেক্টকে দিয়ে বাড়ি বানায়, তখন বেশ আয়োজন করে বলে তার কী কী প্রয়োজন। যেমন_মাস্টার

www.BDeBooks.Com

বেডরুমের সঙ্গে বারান্দা থাকতে হবে। ফ্যামিলি স্পেসে বই রাখার লাইব্রেরি হবে। সার্ভেন্টস টয়লেট আলাদা হবে। ইত্যাদি।

আমার কাছে যারা নাম চাইতে আসে, তারাও বেশ আয়োজন করেই তাদের দাবিগুলো তোলে। যেমন_এক মা তার ছেলের নামের জন্য এসেছে_

স্যার! ছেলের নামের প্রথম অক্ষর হবে আ। কারণ আমার নামের প্রথম অক্ষর ' আ' , আতিয়া। শেষ অক্ষর হবে ' ল' । কারণ ছেলের বাবার নামের প্রথম অক্ষর ' ল' , লতিফ। নামের অর্থ যদি নদী, আকাশ বা মেঘ হয়, তাহলে খুব ভালো হয়। তার চেয়েও বড় কথা_নামটা হতে হবে আনকমন।

আমি বললাম, ছেলের নাম রাখো আড়িয়াল খাঁ। নদীর নামে নাম। আড়িয়াল খাঁ নামে আমাদের একটা নদী আছে, জানো নিশ্চয়ই?

ছেলের মা গম্ভীর মুখে বললে, আড়িয়াল খাঁ নাম রাখব?

হ্যাঁ, তোমার সব ইচ্ছা এই নামে পূরণ হচ্ছে। নদীর নামে নাম, আনকমন নাম, শুরু হয়েছে তোমার নামের আদ্যক্ষর ' আ' দিয়ে, শেষ হচ্ছে তোমার স্বামীর নামের আদ্যক্ষর দিয়ে।

আমার স্বামীর বংশ খাঁ বংশ না।

তাতে কী? তোমার ছেলে খাঁ বংশের পত্তন করবে। তার থেকেই শুরু হবে খাঁ বংশ।

স্যার। আপনাকে আমার ছেলের নাম রাখতে হবে না। ধন্যবাদ।

তোমাকেও ধন্যবাদ।

শুধু যে ছেলেমেয়েদের নাম তা- না, আমাকে অনেক স্থাপনার নামও রাখতে হয়েছে। কাকলী প্রকাশনীর মালিক সেলিম সাহেব উত্তরায় বিশাল চারতলা বাড়ি তুললেন। আমাকে নাম রাখতে হলো। নাম রাখলাম ' বৃষ্টি বিলাস' ।

সেলিম সাহেব বাড়ির সামনে শ্বেতপাথরের ফলকে লিখলেন_ এই বাড়ির নাম রেখেছেন...।

সময় প্রকাশনীর ফরিদ ময়মনসিংহে বাড়ি করবে। বাড়ির নাম আমি ছাড়া কে রাখবে? নাম দিলাম ' ছায়াবীথি' ।

নামকরণ চলছেই। এই নামকরণের একটা ভালো দিক হচ্ছে, রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের নামের পরিবর্তন হবে না।

পাদটীকা

ওল্ড ফুলস ক্লাবের সান্ধ্যসভায় কলকাতার এক ভাষাতত্ত্ববিদ উপস্থিত হলেন। আমরা সবাই চেষ্টা করতে লাগলাম জ্ঞানী টাইপ কথা বলার। তেমন কোনো জ্ঞানী কথা খুঁজে না পেয়ে আমি বললাম, আচ্ছা ভাই। আম নামটা কিভাবে এল? আমের বদলে জাম নাম আমরা কেন রাখলাম না?

ভদ্রলোক বললেন, আমের নাম যদি জাম রাখা হতো তাহলে আপনি বলতেন, জাম রাখা হলো কেন? কেন আম রাখা হলো না?

আমি বললাম, অত্যন্ত সত্যি কথা। বাংলা ভাষাভাষী বিশাল ভূখণ্ডে সবাই একসঙ্গে আমকে আম ডাকা শুরু করল কেন? মিটিং করে কি ঠিক করা হয়েছিল এই ফলটার নাম হবে আম? আমি যত দূর জানি অতি প্রাচীনকালে মানবসমাজ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে ছড়িয়ে- ছিটিয়ে ছিল। এক দলের সঙ্গে আরেক দলের যোগাযোগই ছিল না। অথচ সবাই একটা ফলের নাম রাখল ' আম' । এক হাজার মাইল লম্বা নদী ব্রহ্মপুত্র। সবাই তাকে ব্রহ্মপুত্রই ডাকছে। কে রেখেছিল আদি নাম?

ভাষাতত্ত্ববিদ হকচকিয়ে গেলেন। আবোল- তাবোল কথা বলা শুরু করলেন। তাঁর জন্য ওই দিনের আসর ছিল শিক্ষাসফর।

কুইজ

আমাদের পাঁচ আঙুলের একটির নাম অনামিকা (রিং ফিঙ্গার) অর্থাৎ নামহীন। এই আঙুলটির নাম নেই কেন?

উত্তর : মহাদেব শিব তাঁর হাতের অনামিকা দিয়ে চারমাথা ব্রহ্মার একটা মাথা ঘাড় থেকে ফেলে দিয়েছিলেন।

www.BDeBooks.Com

এই কাজের পর পর মহাদেব অনুতাপে দগ্ধ হলেন। যে আঙুল দিয়ে তিনি এই কাজটি করেছেন, সেই আঙুলকে তিনি অভিশাপ দিলেন। বললেন, আজ থেকে তুই নাম গ্রহণের যোগ্যতা হারালি। আজ থেকে তুই অনামিকা।
[উৎস : বাংলা শব্দের উৎস অভিধান। ফরহাদ খান।]

১৫
একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি

আমার শৈশবের একটি অংশ নাপিতের অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে কেটেছে। বাবা এক হিন্দুস্তানি (ভোজপুরি) নাপিতের ব্যবস্থা করেছিলেন যে বাসায় এসে বাচ্চাদের চুল কেটে দিত। নরুন দিয়ে নখ কাটত। নাপিতের স্বাস্থ্য এবং গোঁফ ছিল দর্শনীয়। তাকে দেখামাত্র পালিয়ে যাওয়া ছিল আমার প্রথম রিফ্লেক্স অ্যাকশন। পালিয়ে রক্ষা নেই, নাপিতই আমাকে ধরে আনত। মাটিতে বসিয়ে দুই হাঁটু দিয়ে মাথা চেপে ধরত। কান্নাকাটি চিৎকারে কোনো লাভ হতো না। ছেলেমেয়েদের কান্না এবং চিৎকারকে মা কোনোরকম গুরুত্ব দিতেন না। তাঁর থিওরি হলো বাচ্চারা কাঁদবে, চিৎকার করবে এটা তাদের ধর্ম। হাত- পা না ভাঙলেই হলো।
ক্লাস ফোরে ওঠার পর ভোজপুরি নাপিতের হাত থেকে মুক্তি পেলাম। মা এক দিন হাতে একটা সিকি (পঁচিশ পয়সা) ধরিয়ে দিয়ে বললেন, যা সেলুনে চুল কেটে আয়। জীবনের প্রথম সেলুনে চুল কাটতে গেলাম। নাপিতের প্রশ্ন, পয়সা এনেছো? আমি হাতের মুঠি খুলে সিকি দেখালাম।
চুপ কইরা বইসা থাকো। পাও নাড়াবা না। সেলুন কোনো দুষ্টুমির জায়গা না।
আমি চুপ করে বসে দোকানের সাজসজ্জা দেখতে লাগলাম। বোররাক নামক এক প্রাণীর বাঁধানো ছবি। বোররাক হচ্ছে একটা পাখাওয়ালা ঘোড়া। এর পিঠে চড়েই নবীজী (দ.) মেরাজ শরীফে গিয়েছিলেন।
দ্বিতীয় ছবিটি ক্ষুদিরামের। তার গলায় ফাঁসের দড়ি। কয়েকজন ইংরেজ তাকে ঘিরে তাকিয়ে আছে। একজনের হাতে ঘড়ি। সে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আছে। মনে হয় ঘড়ি দেখে ইশারা দেওয়ার পর ফাঁসি কার্যকর হবে।
ক্ষুদিরামের ফাঁসি নিয়েই অতি বিখ্যাত গান_ ' একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি' । গানের প্রসঙ্গ আনলাম। কারণ আমি বিদায় নিতে চাচ্ছি_পাঠকদের কাছ থেকে। ফাউনটেনপেন অনেকদিন লেখা হলো_কালি শেষ হয়ে যাবে সেটাই স্বাভাবিক। ' ঘেঁটুপুত্র কমলা' নামের একটা ছবির কাজে হাত দিচ্ছি। এখন ব্যস্ততা ছবি নিয়ে। আমার মতো প্রবীণদের ঘেঁটু শব্দের অর্থ পরিচিত। এই সময়ের তরুণরা না।
সুনামগঞ্জ এলাকার জলসুখা গ্রামের বাউল আখড়ায় প্রথম ঘেঁটু গান শুরু হয়। নাচ- বাজনা এবং গান। খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার, গানের সুর হলো ক্লাসিক্যাল ধারায়। একটি রূপবান বালককে মেয়ে সাজানো হতো। সে নেচে নেচে গান করত। মাঝে মাঝে দর্শকদের কোলে বসে তাদের গলা জড়িয়ে ধরত।
সংগীতের এই ধারায় অতি দ্রুত কদর্যতা ঢুকে যায়। নারীবেশী কিশোরদের জন্যে পুরুষরা লালায়িত হতে শুরু করেন। এক সময় বিত্তবানদের মধ্যে ঘেঁটুপুত্র কিছুদিনের জন্যে বাড়িতে এনে রাখা রেওয়াজে পরিণত হয়। বিশেষ করে সিলেট- ময়মনসিংহের হাওর অঞ্চলে তিন মাসের জন্যে ঘেঁটু রাখা পরিণত হয় রেওয়াজে। কারণ এই তিন মাস হাওর থাকে জলমগ্ন। আমোদ- ফুর্তিতে সময় কাটানো ছাড়া কিছু করার নেই। আমজনতা সময় কাটায় তাস খেলে, ' দবা' (দাবা) খেলে, গান- বাজনা করে। শৌখিনদার বিত্তবানরা তিন মাসের জন্যে ঘেঁটুপুত্র নিয়ে আসেন। ঘেঁটুপুত্র রাত্রিযাপন করে শৌখিনদের সঙ্গে। শৌখিনদারের স্ত্রী চোখের জল ফেলেন; তিনি ঘেঁটুপুত্রকে দেখেন তার সতীন হিসেবে। প্রাচীন সাহিত্যেও বিষয়টা উঠে এসেছে_
" আইছে সতিন ঘেঁটুপুলা
তোরা আমারে বাইন্ধা ফেল

www.BDeBooks.Com

পুব হাওরে নিয়া..."

প্রকাশ্য সমকামিতার বিষয়টা সেই সময়ের সমাজ কী করে স্বীকার করে নিয়েছিল আমি জানি না। তবে আনন্দের বিষয় ঘেঁটুগান আজ বিলুপ্ত। সেই সঙ্গে বিলুপ্ত সংগীতের একটি অপূর্ব ধারা।

আমার সংগ্রহের ঘেঁটুগানগুলো ঘেঁটুপুত্র কমলায় ব্যবহার করা হবে। প্রাচীন আবহ তৈরির চেষ্টা করব। কেন জানি মনে হচ্ছে এটিই হবে আমার শেষ ছবি।

ইচ্ছা ছিল সম্পূর্ণ নিজের টাকায় ছবিটা করব। অন্যের টাকায় ছবি করার অর্থ নিজেকে কিছুটা হলেও বন্ধক রাখা। দুঃখের ব্যাপার হলো ছবি তৈরিতে যে বিপুল অঙ্কের অর্থ লাগে তা আমার নেই।

ছবি বানাতে গিয়ে টাকার সমস্যায় পড়লেই আমি আসাদুজ্জামান নূরের কাছে যাই। নূর প্রথম যে বাক্যটি বলেন, তা হলো টাকা কোনো ব্যাপারই না। আপনার কত টাকা লাগবে?

এবারও অতীতের মতো একই কথা বলে আমার হাত থেকে বাঁচার জন্যেই হয়তো জার্মানিতে গিয়ে বসে রইলেন। তাঁর আর কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না।

ওউখঈ নামক এক অর্থ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। ছবি বানানোর জন্যে তারা আমাকে টাকা ধার দেবে কি না। তাদের এক কর্মকর্তা বলেছেন, ছবি বানানোর জন্যে আমরা টাকা দিই না। তবে আপনাকে অবশ্যই দেব।

এদের কথা শুনে আমার প্রাথমিক শঙ্কা দূর হয়েছে। তার চেয়ে বড় কথা, শেষ খুঁটি চ্যানেল আইয়ের সাগর তো আছেই। সাগরের সঙ্গে প্রচলিত একটি গল্প এ রকম_

পত্রিকায় ফিল্মের ওপর ফ্রিল্যান্স লেখা লেখে এমন এক সাংবাদিক গিয়েছে। মুখ কাঁচুমাচু করে বলেছে, সাগর ভাই একটা ছবি বানানোর খুবই শখ।

সাগর : নাটক, সিনেমা এইসব আগে কখনো বানিয়েছো?

সাংবাদিক : না। তবে এইসব বিষয়ে আমার ব্যাপক পড়াশোনা।

সাগর : চিত্রনাট্য কি তৈরি?

সাংবাদিক : শুরু করেছি। তিন পৃষ্ঠা লিখে ফেলেছি।

সাগর : ছবির বাজেট কত?

সাংবাদিক : আপনি যা দেন তার মধ্যে শেষ করে ফেলব ইনশাআল্লাহ।

সাগর : খোঁজ নাও তো শেরাটনের বলরুম কবে খালি।

সাংবাদিক : কেন সাগর ভাই?

সাগর : ছবির মহরত করবে না?

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, জীবন শুকায়ে গেলে করুণাধারায় যেতে হয়। ফিল্ম মেকারের জীবন শুকায়ে গেলে তারা যায় সাগরের কাছে।

ঔপন্যাসিক ইমদাদুল হক মিলনকে ধন্যবাদ। তাঁর আগ্রহেই ফাউনটেনপেন শুরু করা। কালের কণ্ঠের পাঠকদের ধন্যবাদ। তাদের আগ্রহেই লেখা চালিয়ে যাওয়া। ঘেঁটুপুত্রকে ধন্যবাদ। তার কারণেই লেখা বন্ধ, খানিকটা বিশ্রাম।

পাঠকদের সঙ্গে আবারও দেখা হবে নতুন কোনো কলম নিয়ে। লেখার অভাব আছে, কলমের অভাব নেই_

১. নিব কলম

২. খাগের কলম

৩. শ্লেট পেনসিল...

পাদটিকা

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম কিন্তু ঘেঁটুগানের ফসল (লেটো গান, জিনিস একই)। তাঁর সংগীতের প্রথম পাঠ হয় লেটো গানের দল।

www.BDeBooks.Com

কুইজ

বিশ্বকাপ ফুটবল শুরু হয়েছে। আমরা সাপ- লুডু ছাড়া তেমন কিছু খেলতে পারি না। তাতে কী হয়েছে? আমাদের আহ্লাদের সীমা নেই। পাড়ায় পাড়ায় ব্রাজিল, আর্জেন্টিনার ফ্ল্যাগ উড়ছে। অনেক বছর আগে আর্জেন্টিনা বিশ্বকাপে হেরে গিয়েছিল। আমি তখন ময়মনসিংহে_অয়োময় নামের ধারাবাহিক নাটকের ইউনিটের সঙ্গে আছি। আর্জেন্টিনার পরাজয়ের পর পর বিশাল জঙ্গি মিছিল বের হলো। স্লোগান_আর্জেন্টিনার পরাজয় মানি না, মানি না।

এক দড়িতে দু' জনের ফাঁসিও চাওয়া হলো। একজন রেফারি আরেকজন হচ্ছে আর্জেন্টিনার বিপক্ষের গোলদাতা। তাঁর নাম মনে নেই।

বিশ্বকাপ উপলক্ষে কুইজ বিশ্বকাপ নিয়েই হওয়া উচিত।

প্রশ্ন : ফুটবল খেলার শুরুটা কিভাবে হয়?

উত্তর : চিনের মিং ডায়ানাস্টির গোড়ার দিকে শুরু। মিং রাজাদের হাতে পরাজিত সেনাপতিদের কাটা মুণ্ডু সম্রাটের সামনে রাখা হতো। সম্রাট কাটা মুণ্ডুতে লাথি দিতেন। মুণ্ডু গড়িয়ে যেত, সম্রাট আনন্দ পেতেন। তাঁর আনন্দ থেকেই_ফুটবল।

BDeBooks.com

E-BOOK

www.BDeBooks.com
FB.com/BDeBooksCom
BDeBooks.Com@gmail.com